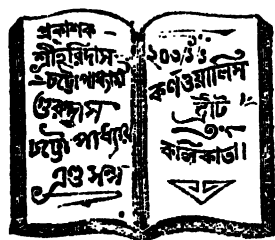
সাথী

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

আষাঢ়—১৩৩১

মূল্য ২৲ দুই টাকা



প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙা৺।
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়া৺
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিক৺

উৎসর্গ

এ কালের কালিদাস

কবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি-এ

সুহৃদ্বরেষু—

সাথী

প্রথম পরিচ্ছেদ

কর্দমে কমল

একাদিক্রমে তিনমাস জলভ্রমণ করিয়া নিকুঞ্জবাবু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অগ্রপশ্চাতে জল লইয়া আর একদণ্ডও থাকিতে পারিতেছেন না। কেবলই ইচ্ছা হইতেছিল, বোটখানি কোন এক তীরে লাগাইয়া কিছুদিন স্থলে বাস করেন কিন্তু যে নদীর উপর দিয়া নিকুঞ্জ বাবুর সবুজ রঙের বোটখানি ভাসিয়া চলিয়াছে তাহার নীল জলের সহিতই তাঁহার পরিচয়। সে নদীর কূলে কোথায় যে জন মানবের বাসও আছে তাহার পরিচয় এই ক'দিনেও পাওয়া যায় নাই। থাকিবার মধ্যে আছে, উলুবন, বাবলাশ্রেণী আর দূর প্রসারিত বালির চর। সে উলুবনের শেষ আছে, বাবলাশ্রেণীও মাঝে মাঝে হারাইয়া গিয়াছে কিন্তু সে বালির চড়ার আদি নাই, অন্ত নাই। সৃষ্টির আবর্জনা-স্বরূপ রাজ্যের বালি যেন স্রষ্টা এই নদীর দুই কিনারে পাঠাইয়া দিয়া ময়লা সাফ করিয়াছেন।

নিকুঞ্জবাবুর বয়স হইয়াছে; প্রৌঢ় বলিতে সন্দেহ হয় না! কাজেই যে বয়সে নদীর নীল জলের রাশি, শ্বেত শুভ্র কাশ ফুল লোকের মনরঞ্জন করিতে সমর্থ হয় সে বয়স নিকুঞ্জ বহুদিন পার হইয়াছেন। এখন বালির চড়ায় লুণ্ঠিত সূর্য্য রশ্মিস্নাত বর্ণ সৌন্দর্য্য তাঁহার দৃষ্টিস্নান সেই

চক্ষে আর লাগে না; তিনি চান, নিরস কঠোর হাড়ে-মাসে গড়া মানুষ দেখিতে। কিন্তু এ মনুষ্য-বর্জিত নদীর কোন ধারেই মানুষ আসে না, যায় না।

শরতের শেষ। নদী শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, নদীর সে রক্ত শোভার পরিবর্ত্তে নিবিড় নীলিমায় বুক ভরিয়া গিয়াছে; সে নীল স্বচ্ছ বারিবক্ষখানি আকাশের আলোকে উজ্জ্বল হয়; ম্লান হয়; নক্ষত্র পুষ্পের মালা পরিয়া দোলে, চ'লে, গান গায়। কিন্তু নেহাৎই পুরাতন। নিকুঞ্জের চক্ষু সে দৃশ্য দেখিয়া আনন্দ পায় না। এ দেশের আকাশে মেঘ ভাসিয়া আসে না, এখানে বৃষ্টি পড়ে না, বিদ্যুৎ খেলে না, এ নদীতে ঢেউ উঠে না, বান ডাকে না, সবই যেন বৈচিত্র্য বিহীন, শ্রীহীন পুরাতন।

প্রভাতে সূর্য্য উঠে; একটু একটু করিয়া আলোক রথে চড়িয়া কোন্ দূর দেশের কোন্ অন্ধকারে আত্মগোপন করে, আগমনে বিচরণে অন্তর্দ্ধানে কত নূতনত্বের সৃজন করিয়া যায়, নিকুঞ্জ দেখেন; শুষ্ক হৃদয়ের দ্বার সজোরে অবরুদ্ধ করিয়া ভাবেন, মানুষ কোথায়? এত সৌন্দর্য্য হেলায় হারাইয়া দিবার কি প্রয়োজন ছিল স্রষ্টার!

নিকুঞ্জের সহচর শ্যামসুন্দর প্রকৃতির পূজারী কোনদিনই নন, মনুষ্যের অভাব তিনি এতটুকুও বোধ করিতেছেন না বরং উত্যক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ভাবিতেছেন, গোটা কতক লোক অনর্থক অন্ন ধ্বংস করিতেছে, তাহাদের সঙ্গে আনিবার, ভক্ষক সংখ্যা বাড়াইবার কোন দরকারই ছিল না। অলস মধ্যাহ্নটা যখন নিকুঞ্জকে ক্ষিপ্ত করিবার উপক্রম করে তখন তিনি পরমানন্দে অন্নব্যঞ্জন হজম ও সুনিদ্রায় মন দেন; যে রাত নিকুঞ্জর বসিয়া কাটে না, ঘুমকে কাছে ডাকে না, সেই রাতের বিনাশ কামনায় প্রভু যখন একাগ্রচিত্ত, শ্যামসুন্দর সে সময়ে নিদ্রাযোগে পর্বত-

প্রমাণ সন্দেশ ও কাঁকরের মত রসগোল্লার আবাসস্থলের সন্ধানে তৎপর। তবুও যে একাদিক্রমে বহুদিন এই দুই ভিন্ন প্রকৃতির লোকের মিলন অক্ষুণ্ণ ছিল কি করিয়া বাস্তবিক বিস্ময়। বিস্ময় ভেদ করিতে গিয়া দেখা গিয়াছে দুইটি কারণ প্রবল হইয়া এই অসাধ্য সাধিয়াছে। শ্যামসুন্দর কলিকাতাতেও নিকুঞ্জের মত ধনীর গৃহবাসী হইলেও নদীভ্রমণই স্বাস্থ্যোন্নতির দিক দিয়া সমর্থন করেন; বলেন এখানে দেড়া হজম হচ্ছে। আর একটা কারণ, নিকুঞ্জ অল্পভাষী, মৃদুস্বভাব, শান্ত প্রকৃতির। শ্যামসুন্দর আহার করিতে সময় একটু বেশী লয়েন নিকুঞ্জ তাহাতে বিরক্ত হন না; তিনি ভোজন কক্ষের দেওয়াল-গায়ে মনের বিচিত্র রঙে আঁকা সৌন্দর্য্য ছবির ছায়া লইয়া খেলা করেন; নিকুঞ্জ নিদ্রার প্রচুর সময় দিতে কার্পণ্য করেন না, বাক্যবাণ দেন না, কহিবার কথা না থাকিলেও না কথা কওয়ার কৈফিয়ৎ নির্বাক অভিনয়ে চাহেন না। নিকুঞ্জের এত গুণের ঋণ শ্যামসুন্দর কোন কালেই শুধিতে পারিবেন না।

কিন্তু আজ দু'জনে একটু বাধিয়া গেল। নিকুঞ্জ বলিলেন, ঘাট না থাকে, কাট; রাস্তা না থাকে, পথ তৈয়ার কর; যতদূরে হোক, যেখানে হোক মানুষ আজ দেখিতেই হইবেই; আজ নৌকা ত্যাগ করিয়া গ্রাম পাই ভাল; নয় ত হাঁটিয়া সহরে যাইব, নৌকা আর চড়িব না।

শ্যামসুন্দর ইহা অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। নিকুঞ্জের এখানে কোন কষ্ট নাই, স্বাস্থ্য তাঁহার পূর্ব্বাপেক্ষা যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে; মস্তিষ্কের যে রোগটি সহরে থাকিতে কঠিন ভাব ধারণ করিতেছিল, নৌকায় উঠার পর হইতে একদিনও সে'টি দেখা দেয় নাই; নিকুঞ্জের রক্তহীন পাংশু দেহ আবার রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে; বসা গাল আবার পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তবু যে নিকুঞ্জ ডাঙ্গা ডাঙ্গা করিয়া এমন উন্মাদ হইয়া উঠিতেছেন, তাহাতে শ্যামসুন্দরের বিরক্ত হইবারই কথা!

কিন্তু নিকুঞ্জ কোন কথা শুনিতেই প্রস্তুত নহেন। ডাঙ্গায় আজ নৌকা লাগে, লোকালয় মিলে, ভাল ; নচেৎ আজ রাত্রি প্রভাতে নৌকার মুখ ফিরাইতেই হইবে।

শ্যামসুন্দর হাড়ে চটিয়া গেলেন। যদিও উভয়ের মধ্যে ঠিক প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক বর্তমান ছিল না, উপকারী ও উপকৃতেরই সম্বন্ধ, তবুও মনের রোষ মুখে প্রকাশ করিবার মত সাহস শ্যামবাবুর ছিল না ; তিনি শুধু গোঁজ গোঁজ করিয়া বলিলেন—মানুষের যখন দুর্বুদ্ধি জোটে, তখন ভাল-কথা কিছুতেই তাহার কাণে ঢোকে না।

শ্যামসুন্দর যতই গোঁজ গোঁজ করিয়া অদৃষ্ট দেবতার উদ্দেশে কটূক্তি করিতে লাগিলেন, নিকুঞ্জ তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে করিতে স্থলের সন্ধানে ব্যগ্রতা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

তাহার পরে ধৈর্য্য রক্ষা করা শ্যামসুন্দরের পক্ষে সুকঠিন হইয়া উঠিল ; কুপিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—দেশে তোমার কে আছে হে বাপু, যে ফেরবার জন্যে এমন কাটা ছাগলের মত ছটফট করছ। থাকবার মধ্যে ত ভুতুড়ে সেই বাড়িখানা ! তারই জন্যে এত !

নিকুঞ্জ এ কথার কোন উত্তর দিলেন না ; ইচ্ছা করিয়াই দিলেন না। দিলেও শ্যামসুন্দর বুঝিতেন না, তাই দিলেন না। উদরমাত্র সম্বল করিয়া যে লোক পৃথিবীতে বাস করে, তাহার কাছে বিশ্বের কোন বস্তুরই মূল্য নাই। বাড়ীর মায়া যে কি বস্তু, শ্যামসুন্দর তাহা বুঝিবে কি করিয়া !

শ্যামসুন্দর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—ডাঙ্গা ডাঙ্গা ত খুব করছ, ডাঙ্গায় উঠে কি করবে শুনি ?

তা জানিনে শ্যাম। তবে মনে হচ্ছে—একটা কিছু করব !

ডাক্তারের বারণ মনে আছে ?

আছে।

তবে? ·

নিকুঞ্জ ঔদাস্যের সহিত বলিলেন—ডাক্তারের বারণ মানাই কি জীবনের সব চেয়ে বড় কামনা শ্যাম?

শ্যামসুন্দর হাসিয়া বলিলেন—নিশ্চয়! আপনি বাঁচলে তবে বাপের নাম।

নিকুঞ্জ হাসিলেন, বলিলেন—শ্যাম, আমার কি মনে হয় জান?

কি!

এই বারোটা বছর আমার জীবনের সব চেয়ে দুঃসময় গেছে, শুধু ডাক্তারের বারণ মেনে। আজ মনে হচ্ছে, এতটা না করলেও চলতো!

চলতো ঘোড়ার ডিম! কবে পটল তুলতে হোত!

তাহ'লেও এত দুঃখ ছিল না শ্যাম!

নিকুঞ্জ ম্লান মুখে কথা কয়টি বলিয়া নীরব, নির্জন অন্ধকারের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। শ্যামসুন্দর বারকতক আপনার মনে কতকগুলা কি বকিয়া শান্তভাবে তাকিয়া আশ্রয় করিলেন; অল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহার নাসিকা গর্জনের শব্দ শ্রুত হইল।

নিকুঞ্জ সেই ম্লান আলোকিত কক্ষে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আর জীবনের এক একটি দৃশ্য একটির পর একটি তাঁহার মনের পাতায় ভাসিয়া উঠিয়া তাঁহাকে অধিকতর পীড়িত করিয়া তুলিল। কি এ অসহ অবহ জীবনের ভার তাঁহার উপর চাপিয়া বসিয়াছে! এর যে কোন দিকে একটু মুক্তি নাই, শান্তি নাই, সুখ নাই, বিশ্রাম নাই; সব যে শূন্য, অসীম, অনন্ত শূন্য! খা খা করিতেছে, মরুভূমির মত, মধ্যাহ্নের আকাশের মত!

অথচ একদিন ছিল। একদিন ছিল, যখন এই জীবনেরই স্বর্ণ সূত্রটির

দিকে চাহিতেও আনন্দে, তৃপ্তিতে এত বড় বুকখানাও কূলে কূলে, কানায় কানায় ভরিয়া উঠিত! রূপময়ী, প্রেমময়ী পত্নীর প্রেম ছিল; সুন্দর শিশুর কলহাস্য ছিল; গৃহখানি ছিল, নিত্য উৎসবের মন্দির! বিধাতার কঠোর বিধানে সে মন্দির-চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, পত্নী পুত্র একদিনে একই কাল-ব্যাধিতে অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেল। তিলে তিলে ও পলে পলে তাহাদের শোকাগ্নিতে পুড়িয়া মরিবার জন্য একমাত্র নিকুঞ্জই কালের বর্জিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

তারপর কতদিন, কতদিন কাটিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর কত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, কাল নিকুঞ্জেরও বহু পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়াছে। প্রিয়তমার সে প্রেম ঢল ঢল আনন অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে; শিশুর কলহাস্যের সে মধুর স্বপ্ন আজ আর রাগ রাগিনী রচনা করে না; সবই কালের কবলে বিলীন হইয়াছে। কেবল নিকুঞ্জ তখনও ছিলেন, এখনও আছেন। তখনকার দুর্বহ জীবন এখন অবহ হইয়া পড়িয়াছে। এক দণ্ড আর সে ভার বহিতে ইচ্ছা হয় না।

স্তব্ধ নিশীথে, নিরালায় বসিয়া নিকুঞ্জ জীবনের পাতাগুলি উল্টাইয়া চলিলেন। সে জীবনেতিহাসের অতীত অশ্রুময়; বর্ত্তমান অশ্রুময়, ভবিষ্যৎ আরও অশ্রুময়। ত্রিকাল ভরিয়া অশ্রু আর অন্ধকার! কোথাও এতটুকু আলোকের কণা নাই! এক বিন্দু আলোকের জ্যোতি নাই! ভাবিতে ভাবিতে নিকুঞ্জের চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল! আজ বহু, বহুদিন পরে কাহার সুকোমল দু'টি বাহুর বেষ্টনীতে আপনা বিলাইয়া দিয়া নিঃস্ব রিক্ত হইবার আকুলতায় নিকুঞ্জের জরাজীর্ণ বুকখানা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। অথচ কাহার মৃদু কোমল, স্নিগ্ধ পেলব সে ঈপ্সিত বাঞ্ছিত বাহুযুগল তাহার সন্ধান তিনি জানেন না! কে সে, কোথা সে, কেমন সে, কিছুই জানেন না, তবু মনে হয় সে সুন্দর বাহুযুগল ঈশ্বর তাঁহারই

জন্য সৃজন করিয়াছেন; কোন্ অজানা দেশের কোন্ অজানা স্থানে থাকিয়া সেই প্রসারিত বাহুযুগল চুম্বকের মত তাঁহাকেই আকর্ষণ করিতেছে। যেন বহুদিনের পরিচিত, যুগ যুগান্তের কামনার ধন, যেন জীবন মরণের দুইটি তারকে সে তাহার কোমল করস্পর্শে এক করিয়া রাখিয়াছে।

সে কি অতীতের? কৈ অতীতের মথিত বারিরাশির মধ্য হইতে তাহার মূর্তি ত প্রকাশ পায় না! বর্ত্তমানও ত তাহাকে রঞ্জিত করিয়া দেখাইতে পারে না! তবে কি সে ভবিষ্যতের! কিন্তু কৈ, ঘনান্ধকার-ময় ভবিষ্যতের ঘন আবরণ ভেদ করিয়াও ত তাহার মানসী প্রতিমাকে তিনি দেখিতে পাইতেছেন না! তবে সে কে? কোথা সে? কে এমন করিয়া স্বর্ণ-শৃঙ্খল ধরিয়া বসিয়া আছে? সে কোন্ পারের যাত্রী? এ পারের, না, অদৃষ্টপূর্ব, অজ্ঞাত, অপরিচিত, অ-কল্পিত ও-পারের যাত্রী সে?

বার বৎসর পূর্বে, স্ত্রী-পুত্র বিয়োগের পর নিকুঞ্জের হৃদপীড়া হইয়াছিল। চিকিৎসকগণ শঙ্কিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে কোন সময়ে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইতে পারে! নিশ্চিন্ত থাকিয়া, নিরুপদ্রবে যে ক'টা দিন কাটিয়া যায়, সেই ক'টা দিনই ভাল! জীবনের মমতায় নয়—যন্ত্রণায় নিকুঞ্জ তখন হইতেই চিন্তাশূন্য হইয়া থাকিতে চাহিতেন। যন্ত্রীগণ দিবারাত্র নির্বিশেষে যন্ত্রালাপ করিয়া তাঁহার চিত্তবিনোদন করিত; চিত্রকরগণ দেশ-বিদেশের শোভা-সৌন্দর্য্য-বিমণ্ডিত চিত্র দেখাইয়া পারিশ্রমিক লইয়া যাইত; অনাথ-আতুর ভিক্ষুক সর্ব সময়েই তাঁহার গৃহে আসিয়া সমারোহ করিত—নিকুঞ্জ নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন। কিছুকাল—কয়েক বর্ষ নিরুপদ্রবে কাটিয়াও ছিল। ক্রমশঃ যন্ত্রালাপ পুরাতন, একঘেয়ে, অশ্রাব্য হইয়া উঠিল; চিত্র-সৌন্দর্য্য

সীমাবদ্ধ হইয়া গেল ; ভিক্ষুকের জয়ধ্বনির উন্মাদনাও বিদূরিত হইল—নিকুঞ্জ আবার হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইলেন।

নিকুঞ্জ জলভ্রমণে বাহির হইতে আদিষ্ট হইলেন। ডাক্তার, ভৃত্য, দ্বারবান, পাচক সঙ্গে আসিল। আত্মীয় বান্ধবের মধ্যে একমাত্র শ্যামসুন্দরই টিকিয়া গিয়াছিলেন, তিনিই আসিলেন। তিন মাস জলভ্রমণ চলিল।

কিন্তু আর চলে না। আজ বিশ্বের স্থল, যেখানে যতখানি, যতটুকু আছে, সব সমস্বরে তাঁহাকে ডাক দিয়াছে। সে আহ্বান উপেক্ষা করিবার সামর্থ্য নিকুঞ্জের নাই।

কিন্তু সে কিসের আহ্বান? চাহিবার, পাইবার, কামনা করিবার তাঁহার কি আছে যে কে ডাক দিয়াছে কি-না দিয়াছে তিনি ছুটিতে চাহিতেছেন! নিকুঞ্জ নিজেই ভাবিয়া পাইলেন না। তবু মনে হয়, আছে! কি আছে, কে আছে, কোথায় আছে, কিছু জানেন না, কিন্তু আছে! নহিলে এতকাল পরে এ হৃদয়ে এমন তরঙ্গ উঠিবে কেন? দুকুল প্লাবিয়া এমন উজান স্রোত বহিবে কেন? আছে! আছে! আছে!

সে কে?—নিকুঞ্জ হঠাৎ বুকের বেদনায় কাতর হইয়া পড়িলেন। চার মাস পূর্বে একদিন এমনই বেদনার সূচনা দেখা দিয়াছিল, এমনই অসহ্য যন্ত্রণা হইয়াছিল, ডাক্তাররা অবিলম্বে গৃহ ত্যাগ করিয়া জল-ভ্রমণে পাঠাইয়াছিলেন। আজ আবার সেই বেদনা সূচিত হইতে দেখিয়া ভয়ে নিকুঞ্জ আড়ষ্ট হইয়া উঠিলেন! সে যন্ত্রণার কথা ভাবিলেও যে অঙ্গ অবশ হইয়া আসে!

নিকুঞ্জ বালিশটাকে বুকে চাপিয়া শুইয়া পড়িলেন। যন্ত্রণা কমিল না, উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। একঘেয়ে, বৈচিত্র্য বিহীন অভিশপ্ত জল-ভ্রমণ শেষ করিয়া এখনই নূতনত্বের মাঝখানে আত্ম-বিসর্জন দিতে ইচ্ছা হইল। যেখানে শান্তি

আছে, সুখ আছে, বৈচিত্র্য আছে ; জীবন যেখানে রসাল, পরিপূর্ণ, সেইখানে—সেইখানে তরী চালাইবার ইচ্ছা হইল।

হায় রে মানুষের ভ্রমান্ধ মন ! আলোকের সম্মুখে পতঙ্গের মতই দশা তোর ! মরিতে পারিলেই যেন তোর সব সাধ পূর্ণ হয় !

এত যে যন্ত্রণা, যাহা মৃত্যুরই পূর্ব-লক্ষণ, দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্ষোভিত করিয়া ফেলিতেছে, তবুত সে মন সেই অ-দেখা রাজ্যের স্ব-কল্পিত মানসীর বিশ্ব-বিমোহিনী মূর্ত্তিতেই ভরিয়া রহিয়াছে। মনে হইতেছে, এই সুখ-চিন্তার মাঝেই আজ যদি তাহার জীবনান্ত ঘটে তবে পর-জীবনে আর তাহাকে এমন বুভুক্ষু, এমন পিয়াসী অতৃপ্ত হিয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে না !......

এই নিঃসঙ্গ, এই নিরানন্দ, এই নিরস জীবন-বহনের যে কি দুঃখ তাহা হয়ত অনেকে কল্পনাই করিতে পারিতেছেন না। একমাত্র তিনিই বুঝিতে পারিবেন যাহাকে কখনও আত্মীয়হীন, বন্ধু-হীন, স্বাধীনতাশূন্য মানব জীবনের বোঝা বহিতে হইয়াছে। হৃদয়ভরা ব্যাকুলতা লইয়া যাহাকে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, বর্ষের পর বর্ষ, অজানা, অচেনা আত্মীয়ের পথ চাহিয়া কাটাইতে হইয়াছে, তিনিই বুঝিতে পারিবেন কি সে গূঢ় মর্মভেদী যন্ত্রণা ! আর, একদিন না, এক মাস না, এক বৎসর নয়, নিকুঞ্জ এই দুর্বহ জীবনটিকে একাদিক্রমে একটি যুগ ধরিয়া বহিয়া লইয়া চলিয়াছেন, কিন্তু আর না, এ জীবনের মায়া করিয়া মমতা করিয়া অনেকদিন নিদারুণ যন্ত্রণা তাঁহাকে সহিতে হইয়াছে, আজ হয় এ জীবনের অবসান হউক, না হয় এ জীবনযাত্রার ধারাটি আমূল পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে।

শ্যামসুন্দর জীবিত কিম্বা মৃত বুঝা গেল না। তাহার নীরব নিস্পন্দ দেহটির দিকে চাহিয়া চাহিয়া নিকুঞ্জের রাগ হইতে লাগিল। ইহাকেই

তিনি তাহার সুখ দুঃখের সঙ্গী করিয়া এই দীর্ঘদিনের প্রবাস যাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন—নিজেকেই ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হইল। ইচ্ছা হইল, ধাক্কা দিয়া তুলিয়া দেন কিন্তু না, তাহাতে লাভ কি হইবে? তাঁহার যন্ত্রণার লাঘব ত তাহাতে হইবে না। যন্ত্রণার ভাগও সে গ্রহণ করিবে না। মিথ্যা নীরব সাক্ষী রাখিয়া কি হইবে? এতটুকু সমবেদনা, সহানুভূতি পাইবার ত আশা নাই; দুইটা সান্ত্বনা বাক্যও না, মিথ্যা তাহাকে জাগাইয়া তবে কি হইবে? কিন্তু যদি আজ...

না, সে চিন্তাও দুঃখের! হৃদয় ভাঙ্গিয়া দেয়। একগুণ যাতনা দশগুণ বাড়িয়া যায় যে!

রজনী গভীর। দাঁড়িরা দাঁড়ের পাশেই গায়ের কাপড় চাপা দিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল; হঠাৎ কাক ডাকার শব্দে জাগিয়া উঠিয়া, একটু সোর-গোল করিয়া উঠিয়া বসিল। একটু পরেই ঝপ ঝপ শব্দ শ্রুত হইল।

নিকুঞ্জ কামরার ভিতরে থাকিয়াই সব শুনিলেন, বুঝিলেন; নৌকা চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। মনে হইল, নৌকার মুখ ফিরাইয়া লইতে বলেন, আলস্যে শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে পারিলেন না। শুইয়া শুইয়া দাঁড়ের শব্দ শুনিতে লাগিলেন।

প্রত্যেকটি শব্দ যেন তাঁহার হৃদয় তটেই আসিয়া পশিতেছিল। নদীর শান্ত বারিবক্ষখানি যেমন দাঁড়ের উত্থান পতনে নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছিল, শব্দসমূহও নিকুঞ্জের মনটিকে আজ তেমনি নাচাইতে লাগিল। অসহ্য যন্ত্রণা, প্রাণ যেন এখনই বাহির হইয়া যাইবে, তবুও, তবুও শব্দের তালে তালে হৃদয় নৃত্য করিতেছে। মনে হইতেছে, আজ যেন তাহার কোন চির-বাঞ্ছিত, চিরাকাঙ্ক্ষিত ধনের সন্ধান পাইবে বলিয়াই সে নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছে; আজ কোন্ স্বপ্ন সত্য হইবে জানিয়াই সর্বজ্ঞ মনটি

তাহার উল্লসিত হইয়া উঠিতেছে! আজ মনে হইতেছে, এই রাত্রি প্রভাতেই সে তাহাকে পাইবে, যাহাকে পাইবার জন্য যুগান্ত কাল ধরিয়া সে নীরবে, একান্তমনে সাধনা করিয়াছে, যন্ত্রণা সহিয়াছে, প্রাণহীন প্রাণ ধারণ করিয়া আছে!

দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলে মানুষের মন কিছুক্ষণের জন্য যেমন থম্‌থমে হইয়া যায়, অপ্রত্যাশিত সুখ চিন্তার ভারেও নিকুঞ্জের মনটি তেমনি হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিকুঞ্জ কোন কথাই ভাবিতে পারিলেন না। আলোকিত সুসজ্জিত কক্ষের কোন কিছুই তিনি দেখিতে পাইলেন না, নিকুঞ্জ চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিলেন।

কতক্ষণ ছিলেন, জানিনা, যখন চক্ষু চাহিলেন,সারা মনখানা ভিজিয়া গিয়াছে, বুক যেন একেবারে খালি হইয়া গিয়াছে, প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে, কিন্তু গৃহ দিবালোকে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! নিকুঞ্জ উঠিয়া বসিলেন। ঝঞ্ঝাকাশে বিদ্যুৎ স্ফুরণের মত রাত্রিকার সেই সুখ-চিন্তাটি মনের উপর দিয়া বিদ্যুদ্বেগে খেলা করিয়া গেল—নিকুঞ্জ নৌকার বাহিরে আসিয়া বেতের চেয়ারে বসিয়া সতৃষ্ণ নয়নে ঘাটের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

ভাসা বাসি ক্যানার স্বরগুলাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বোট যেই মাত্র একটা ব্যাঁক ঘুরিয়াছে নিকুঞ্জ দুইহাতে হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন-- একটা লোক মাছ ধরছে না!—কিন্তু মনে তিনি অনেকখানি নিরাশ হইয়া গেলেন—কেন জানেন না, তাঁহার মানসীকে তিনি এইখানেই দেখিতে পাইবেন, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস।—এমন বিশ্বাস কেন হইয়াছিল—কে জানে; নিকুঞ্জ অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হইলেন।

বেটার কি গেরো—তা বল!

শ্যামসুন্দর ধড়ফড় করিয়া বাহিরে আসিয়া ব্যঙ্গের স্বরে কথা ক'টা

বলিয়া উঠিলেন। বোটখানা কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, লোকটা জামাজুতা পরা না হইলেও ভদ্রলোক, বুঝিতে পারা গেল; লোকটা যে শ্যামসুন্দরের অপ্রিয় টীপ্‌নী শুনিতে পাইয়াছে তাহাও তাহার চক্ষের ভাবেই ফুটিতে নিকুঞ্জ দেখিয়াছিলেন। মূর্খটাকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই দুই হাত তুলিয়া সহর্ষ অভিবাদন জানাইয়া বলিলেন—নমস্কার মশাই! এ জায়গাটার নাম?

সুগন্ধা।

সত্যই সুগন্ধা! আমরা মশাই সুগন্ধাই চাই। বাঁধো—মাঝি!

লোকটি দুইগাছা ছিপই তুলিয়া ফেলিয়া বলিলেন—বড়ই পাড়া গাঁ মশাই! তবে ম্যালেরিয়া নেই—এই যা!

লোকটির স্বদেশ গর্ব ছিল মনে, খুবই; বাঙ্গলা দেশের পল্লীগুলির যদি ভাল মন্দ বিভাগ করা যায়, সুগন্ধা একটু উঁচু স্থান অধিকার করিবেই ইহা তাহার দৃঢ় বিশ্বাস! বোট বাঁধিতে বাঁধিতে লোকটি এই কয়টা কথা শুনাইয়া দিল; 'বড়লাট বাহাদুর চুঁচড়োয় গ্যাসের লাইন খুলতে এসে সুন্ধার নাম করে বলেছেন, সুগন্ধা বঙ্গের আদর্শ পল্লী। এই সেদিন "হিতবাদীতে" বেরিয়েছে'—তাহাও সে বলিতে ভুলিল না।

নিকুঞ্জ "হিতবাদীর" নাম শুনিয়াই বলিলেন—এ নদীটার নাম কি মশাই? ইরাওয়াডী?

লোকটা ইংরেজী জানে না এবং অজ্ঞতা জানিতে দিতেও চাহে না, বেশ গুছাইয়া বলিল—নদীটি ভাগিরথী।

শ্যামসুন্দর ইংরেজীস্কুলে পড়িয়াছিলেন, বলিলেন—ইরাওয়াডী ত দার্জিলিংঙ্গের পাশে। সে এখানে কোথায়!

নিকুঞ্জ "হাঁ হাঁ—তাই বটে—তুমি থাক্‌তে ভূগোল ভুল!" বলিয়া ঝুপ্‌ করিয়া লাফাইয়া পড়িলেন।

মহাশয়ের নিবাস ?

কলকাতা, মশাই। জলভ্রমণে চলেছি।

জলভ্রমণ।

কেন আর বলেন মশাই, ভ্রমণ নয় জল নির্গমণ হচ্ছে।—বলিয়া নিকুঞ্জ হাসিলেন।

মশাইরা ?

ব্রাহ্মণ।

উভয়েই ?

আজ্ঞা হ্যাঁ।

শ্যামসুন্দর স্থলে নামিয়াই লোকটির খালুই অবলোকন করিতেছিলেন, বলিলেন—গঙ্গায় মাছ খায় নাকি মশাই ?

লোকটি হাসিয়া, খায় বৈ-কি। সব রকমই খায়। এই খানকার নদীতে মশাই,—চুঁচড়োর সভায় লাট সাহেব"......বলিতে বলিতে থামিয়া গেল ; নিকুঞ্জর দৃষ্টিই বুড়ার মনকে সেই দিকে টানিয়া লইয়া গেল।

সুগৌর-সুন্দর একটি যুবতী মেয়ে, কলসকক্ষে পাড়ের উপর দাঁড়াইয়া নিচের লোকগুলাকেই দেখিতেছিল, দুই জোড়া চখের যুগপৎ দৃষ্টি সে সহিতে পারিল না, অনেকটা পিছাইয়া গিয়া ঘোমটা টানিয়া দিল। মেয়েটি বরাবর ঘোমটা দেয় না কিন্তু দেশের লোক-যে-নয় তাহার সম্মুখে খালি মাথার লজ্জা লইয়া কি দাঁড়ান যায়।

শ্যামসুন্দর লাট সাহেব প্রশংসিত আদর্শ পল্লীর নদীতে এত মৎস্যাধিক্য সত্বেও খালুই খালি কেন, এ সমস্যার সমাধান কিছুতেই করিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল—দেখুন মশাই, মাছটা খুব বেশী খায় না—নিশ্চয়ই।

লোকটি উত্তর দিল—তা এক এক সময়ে...

নিকুঞ্জ কহিলেন—চলুন মশাই, আপনাদের গ্রাম দেখাবেন।

এ প্রস্তাব লোকটির পক্ষে খুবই লোভনীয় হইয়া উঠিল। গ্রাম দেখিয়া ভদ্রলোক যদি সন্তুষ্ট হইয়া যান, কত লোক মুখে মুখে—সে কথা শুনিবে, সুগন্ধার কত সুখ্যাতিই না বাহির হইবে!—তিলমাত্র সময় মধ্যেই এগুলা ভাবিয়া লইয়া বলিল—সে ত আমাদের ভাগ্যি মশাই! চলুন!

মেয়েটি পাড়ের উপরে দাঁড়াইয়া, পায়ের বুড়া আঙ্গুলে বালিমাটীতে দাগ করিতেছিল, আর আড় চোখে লোকগুলির গতিবিধিও লক্ষ্য করিতেছিল—ঘোমটা-দেওয়া-কার্য্যে সে দক্ষ ছিল না, নতচক্ষে ঘোমটা-টাকে খুবই দীর্ঘ ভাবিলেও সেটা সত্যই চক্ষের নিচে নামে নাই। নিকুঞ্জ উপরে উঠিতেই দেখিলেন, আজ সূর্য্য যেন এই মেয়েটির রূপ ধরিয়া মর্ত্ত্যের পথে হাঁটিতে আসিয়াছেন।—কি সুন্দর রঙটি তাহার, মুখখানি, চক্ষু ফিরিতে চাহে না!

নিকুঞ্জ অতি কষ্টে পা ফেলিয়া, মেয়েটির পাশ কাটাইয়া চলিলেন—কিন্তু সূর্য্যের পিছনের দেশের অন্ধকারের মধ্যে পা দু'টাকে চালান কষ্ট-দায়কই হইয়া পড়িয়াছিল।

মেয়েটি অতি সাবধানে বলিল—মা একবার আপনাকে ডাকছেন কাকা!

যাচ্ছি রে!

এই ছিপ খানুই হোঁচা কাটি হাতে লোকটা ও ঐ পরিপূর্ণ যৌবন-শ্রীর মধ্যে যে কথোপকথন হইল তাহার বিষয়টা কি অরুচিকর! কিন্তু ঐ মেয়ের মুখের কথা এমন মিষ্ট! তাহাতেই শ্রবণ তৃপ্ত হইয়া গেল। ভাগ্যে ঐ অরুচিকর কথাটাই তাহার বলিবার দরকার হইয়াছিল; নহিলে এ কণ্ঠ ত অশ্রুতই থাকিয়া যাইত রে! নিকুঞ্জের হৃদয় ভরিয়া গেল।

লোকটা জিজ্ঞাসিল—ক'দ্দিন আছেন নৌকোয় ?

তিন মাস। আচ্ছা, এখানে কি নদীর জলই খাওয়া হয় ?

গঙ্গার জলের তুল্য জল কি আছে মশাই ! এখানে অন্য কূপ বা পুষ্করিণী নাই।

বা ! বেশ ত দেশ !

লোকটি হাসিল।

সাদা একটা বাড়ী বাবলা বনের ভিতর লুকাইয়াছিল, দেখা গেল। নিকুঞ্জ জিজ্ঞাসিলেন—এটা কি ?

ডাক্-বাঙ্গলা !

ফিরিয়া, শ্যামসুন্দরের অভিপ্রায়টা জানিয়া লইতে মুখ ফিরাইয়া, কলস ভারে নত-দেহা মেয়েটিকে দেখিতে পাইলেন ! সদ্য- ওঠা চন্দ্রের মত মেয়েটির রূপ-রাশি উছলিয়া উঠিল।

নিকুঞ্জ নতকণ্ঠে কহিলেন—এই ডাক্-বাঙ্গলাতেই থাক্‌ব ! কি বল হে শ্যাম !

শ্যাম চিরানুগত বন্ধু, অন্যথা কি বলে !

মেয়েটি চলিয়া গেল ; শরতের পূর্ণ শশধর খানার উপর ক্রুদ্ধ মেঘখানা পাখা বিছাইয়া দিল।

এই ত তাঁহার মানসী ! এই ত চির-ঈপ্সিত, চির-বাঞ্ছিত ধন তাঁহার !

নিকুঞ্জ ডাক্-বাঙ্গলায় ঢুকিলেন।

আবিরুদ্দি-খানসামা ছুটিয়া আসিয়া সেলাম করিল।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কমলের আবাসস্থল

আবিরদ্দি খানসামা অল্প সময়ের মধ্যেই চা, ডিমসিদ্ধ, পাঁউরুটি ভাজা করিয়া টেবিলের উপরে রাখিয়া গেল। নিকুঞ্জ সেই লোকটির দিকে একখানা প্লেট ও একবাটী চা অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিলেন—মহাশয়ের নামটি ত কৈ শুনলাম না।

আজ্ঞে, আমার নাম রাধাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চা খান্।

আজ্ঞে আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, ও সকল আমাদের পক্ষে অচল।

চা-ও ?

আজ্ঞে, না।

নিকুঞ্জ উচ্চ হাস্যে ডাক্‌বাঙলা কাঁপাইয়া কহিলেন—সে কি ! বাঙ্গলা দেশে এমন পল্লীগ্রামও আছে যেখানকার লোক চা খায় না ! এ ত কৈ জানতুম না !

রাধাচরণ স্বদেশ প্রেমে গলিয়া গিয়া বলিলেন—আছে বৈ কি মশায় ! এই সুগন্ধাই তার প্রমাণ। আপনাদের মত চা পাঁউরুটি গিললে এ দেশের লোকের প্রশংসা কি আর লাট সাহেবকে করতে হত !

হত না বুঝি ?

কখনই না। তা' হলে আপনাদের মত ডিসপেপসা, অম্বল, অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য......

নিকুঞ্জ হাসিয়া বলিলেন—কিছু মনে করবেন না রাধাচরণ বাবু। লাট সাহেব আপনার দেশের যতই সুখ্যাতি করুন, আপনাকে দেখে কিন্তু তার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। চেহারায় আপনি যে আমাদের চেয়ে একটা বিশেষ কিছু তা ত বোধ হয় না, আর পেটটির ভিতরে পীলে লিভারও যে একটু বেশী মাত্রাতেই আছে, তা'ও বেশ দেখা যাচ্ছে......

রাধাচরণ প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, ও দু'টির কোনটির পরিচয় অদ্যাপি তিনি পান নাই।

নিকুঞ্জ কড়মড় শব্দে পাঁউরুটি ভাজা চিবাইতেছিলেন, কথা কহিলেন না; শ্যামসুন্দর এতক্ষণে দুই প্লেটের খাদ্যই শেষ করিয়া ফেলিয়া বলিলেন—আচ্ছা মশাই, গঙ্গায় যে মাছ ধরেন, স্রোতে মাছ টানে?

টানে বৈ-কি। তবে সায়া-স্যাঁৎটার দিনে হয় না, যেদিন বান ডাকে, সেদিনটাও ফাঁক যায়। যেদিন রোদ থাকে, হাওয়া টাওয়া থাকে না, বেশ পাওয়া যায়।

বড় মাছ হয়?

হয় কখন-কখন।

নিকুঞ্জ বলিতেছিলেন—আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে বড়ই খুশী হওয়া গেল মশাই......

মুখের কথা মুখেই থাকিয়া গেল। চক্ষু দু'টা ডাক্-বাঙলোর বাহিরে বাবলা শ্রেণীর ওধারের পথটিতে গিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

সেই মেয়েটি!

এবার শূন্য কলস কক্ষে লইয়া, ধীর মন্থর গতিতে ঘাটের দিকেই সে চলিয়াছিল; চকিতের মত একবার ডাক-বাঙলোটাও সে দেখিয়া লইল। তখনি সুগভীর লজ্জায় রাঙা হইয়া চলিয়া গেল

নিকুঞ্জ বক্তব্য শেষ করিলেন—যে কদিন থাক্‌ব, মশাই, এক আধবার আস্‌বেন, দয়া করে'।

রাধাচরণ বলিলেন—আসব বৈ-কি!

শ্যামসুন্দর কহিলেন—আজ আর মাছ ধরবেন না বাঁড়ুয্যে মশাই?

রাধাচরণ একগাল হাসিয়া কহিলেন—দেখি, বাড়ী থেকে একবার ঘুরে আসি, তারপর না হয় বসব'খন।

পদ্মের মত মেয়েটি কলস ভারে নত হইয়া সামনে দিয়া চলিয়া গেল; নিকুঞ্জ স্থির দৃষ্টিতে সেই পথটির উপর চাহিয়া রহিলেন। মেয়েটিই শুধু পদ্মের মত নহে, যে পথ দিয়া সে হাঁটিয়া গেল, সেই পথেও পদ্ম ফুটাইয়া তুলিয়া গেল।

রাধাচরণ পালুই ইত্যাদি হাতে লইয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেই নিকুঞ্জ কহিলেন—চলুন, আপনাদের গ্রামটা দেখে আসি।

রাধাচরণ সগর্বে কহিলেন—আসুন, আসুন!

পথে বাহির হইতে দেখা গেল, মাঝি মাল্লারা তীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কয়েক দিন এই ডাক্‌-বাঙলোতেই বাস করিবেন, এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া নিকুঞ্জ রাধাচরণের সঙ্গে চলিলেন। অদূরে কতকগুলি মাটির গৃহে খড়ো চাল দেখা যাইতেছিল, নিকুঞ্জ তাহা দেখাইয়া বলিলেন—আপনাদের এখানে সবই খড়ো ঘর নাকি মশাই?

রাধাচরণ এই প্রশ্নে একটু দুঃখিত হইয়া পড়িলেন, মুখটা ম্লান করিয়া কহিলেন—আজ্ঞে না, কোঠা বাড়ীই বেশী। এটা একটা মহকুমো!

মহকুমো কি মশাই?

ছব ডিবিজন্‌!

ওঃ—নিকুঞ্জ হাসিটা গোপন করিয়া ফেলিলেন। একটি চার পাঁচ বছরের মেয়ে গোটা দুই বড় বড় গাভীর গলার দড়ি ধরিয়া নির্ভয়ে

জীবদুটিকে নানা কটু ভাষায় শাসন করিতে করিতে সেই দিকেই আসিতেছিল, নিকুঞ্জ বলিলেন—আপনাদের দেশের মেয়েদের সাহস ত খুব বাঁড়ুয্যে মশাই!

রাধাচরণ দুঃখ ভুলিলেন; সহাস্যে কহিলেন, ও আর এমন কি সাহস বলুন—পোষা গরু বৈ ত নয়! তবে সত্যিই সাহস আছে মশাই! খবর জানেন ত, আজকাল সব গাঁয়েই গুণ্ডোর দল, মেয়ে ছেলের উপর কি রকম অত্যাচারটা করছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যাটার সাহস হল না সুগন্ধার কারু গায়ে হাতটি দেয়! একদিন বোদো বৈরাগীর বৌটার পেছনে ক'ব্যাটা লেগেছিল, বোদোর বৌ ঘাটে জল আনতে যাচ্ছিল, কাঁখে ছিল পেতলের কলসী- সেই কাছে আসা, কলসী তুলে একটাকে একদম খাল করে দিয়েছিল, সেই থেকে এ গাঁয়ে আর বদমায়েসের সাড়াই পাওয়া যায় নি। সেক'থাও লাট সাহেব সেদিন বক্তৃতায় বলেছেন।

কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা একটি আধ ভাঙ্গা, পড়-পড় বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিলেন; রাধাচরণ নিকুঞ্জের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—এইটি আমার কুঁড়ে।" তারপর গৃহের দিকে মুখ করিয়া ডাকিলেন—ওরে পচা, এদিকে আয়।

একটি সাত আট বৎসর বয়স্ক নগ্ন দেহ বালক আসিয়া দাঁড়াইল। রাধাচরণ বলিলেন—বেঞ্চিটা টেনে আনত রে! তোর দাদা কোথা?

ঘরে আছে, বলিয়া ছেলেটি অদৃশ্য হইল! একটু পরে সে আর তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উভয়ে একখানা বেঞ্চ ধরাধরি করিয়া বাহির করিয়া আনিল।

রাধাচরণ কাঁধের গামছা খানির দ্বারা বেঞ্চখানিকে ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিলেন—তামাক ইচ্ছা করবেন কি।

তামাক ত আমরা খাইনে বাঁড়ুয্যে মশায়! আপনার যেমন চা অখাদ্য, তামাক—হুঁকো কল্কেও আমাদের তেমনি নিষিদ্ধ!

"কাকা, একবার আসবেন কি?"

অদৃশ্য স্থান হইতে কথাকটি উচ্চারিত হইল। কিন্তু এই রকমের একটি স্বর নিরন্তর নিকুঞ্জের কাণে ঝঙ্কার তুলিতেছিল। নিকুঞ্জ চারিদিক ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন কিন্তু সে স্বর যাহার, তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

যাই মা সুশীলা:—রাধাচরণ দাওয়ায় উঠিয়া চকমকি ঠুকিয়া তামাক সাজিয়া, হুঁকায় বসাইয়া, নিকুঞ্জের কাছে আসিয়া বলিলেন—একটু বসুন, একবার ওবাড়ীটা থেকে ঘুরে আসছি।

তিনি পাশের বাড়ীটায় ঢুকিয়া গেলেন।

তার একটু পরেই সেই মেয়েটি কলস কক্ষে গঙ্গার দিকেই চলিয়া গেল; এবার সে একলা নয়, তাহার সঙ্গে একটি অবগুণ্ঠনবতী বধূও ছিল।

রাধাচরণ ফিরিতেই নিকুঞ্জ বলিলেন—ও বাড়ীটা কার বল্লেন?

আমারই জেঠের। অনেকদিন স্বর্গীয় হয়েছেন। বিধবা আর একটি মেয়ে, একরকম আমারই গলগ্রহ!—ম্লানমুখে কথা কয়টি বলিয়া রাধাচরণ ধূমপান করিতে লাগিলেন; তবে ধূম-পানেও যে তিনি আনন্দ পাইতেছেন না তাহা অর্দ্ধোত্থিত শব্দেই বুঝিতে পারা যাইতেছিল।

শ্যামসুন্দর কহিলেন—বাঁড়ুয্যে মশাই আপনাদের গাঁয়ে হাট বাজার কি রকম?

রাধাচরণ দুঃখ বিস্মৃত হইলেন, বলিলেন—ছোট খাট বাজার একটা রোজই বসে, হাট হপ্তায় দু'দিন—বুধ আর শনি।

মাছটাছ পাওয়া যায় ?

মাছেরই ত দেশ মশাই, মাছ পাওয়া যাবে না !

আঃ বাঁচি মশাই !—শ্যামসুন্দর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

মুখের কথায় নয়, সত্যই শ্যামসুন্দর না খাইয়া মরিতেছিলেন, নিত্য নিরামিষ আহার করিয়া মানুষ কতকাল বাঁচে ? নিকুঞ্জ মাছ মাংস আহার করেন না, আলু, ডিমেই তাঁহার চলিয়া যায় কিন্তু ভগবান জানেন এই তিনটা মাস শ্যামসুন্দরের কি কষ্টেই না কাটিয়াছে। দিন দশেক আগে কালীগঞ্জের বাজার হইতে শ্যামসুন্দর সের দুই মাংস আনিয়া স্বহস্তে পাক করিয়া খাইয়া মৃত-আত্মাটাকে কতকটা প্রাণদান করিতে পারিয়াছিলেন কিন্তু সেই দুই সের মাত্র মাংসের জীবনীশক্তিতে আর কতদিন চলিবে !

শ্যামসুন্দর হর্ষান্বিত ভাবে রাধাচরণের দিকে চাহিয়া বলিলেন—কখন্ বাজার বসে ?

দশটা নাগাত !

যাবেন ত বাজারের দিকে ?

গেলেও হয় !

নিকুঞ্জ কোন কথাই শুনিতেছিলেন না। তাঁহার মনটি তখন সেই নদীর কিনারে কমল-দলের কাছে মত্ত মধুপের মত গুঞ্জরিয়া বেড়াইতেছিল। বাজারে যাইতে আপত্তি আছে কিনা, শ্যামসুন্দরের এই প্রশ্নে নিকুঞ্জের একাগ্রতা ভঙ্গ হইয়া গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই গাছপালায় ঘেরা দূর্বা-ঢাকা কালো পথটি শুভ্র সুন্দর হইয়া উঠিল, সেই কমলের শুভ্র-বিকাশে ! নিকুঞ্জ চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না।

যে দরজা দিয়া রাধাচরণ পাশের বাড়ীটায় ঢুকিয়াছিলেন মেয়েটি সেই দ্বারেই ঢুকিল।

নিকুঞ্জ বলিলেন—ঐটি আপনার জ্যেষ্ঠের কন্যা বুঝি ?

রাধাচরণ ম্লানমুখে কহিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ। দুঃখের কথা বলেন কেন আর! মেয়ের মুখের দিকে চাইলে আর অন্ন জল রোচে না।

বিবাহ হয় নি ?

বিধবার মেয়ে, আমারও এই অবস্থা, জোটাতে পারছি আর কই বলুন!—ভদ্রলোক হুঁকাটি ধরিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

বিচলিত হওয়া, উত্তেজিত হওয়া নিকুঞ্জের পক্ষে মারাত্মক ছিল, নিকুঞ্জ সর্বদাই শান্ত থাকিতে চেষ্টা করিতেন কিন্তু রাধাচরণের কথিত এই দুঃসংবাদে মনটি তাঁহার খুবই বিচলিত হইয়া উঠিল। যেন কোন বাঞ্ছিত স্বপ্নরাজ্যের সম্মুখে আনিয়া কে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছে; পিছনে কিছু নাই, সামনে সেই অজানা, অদেখা, সুন্দর, স্বপ্ন-রাজ্যখানা! উছলিত, উদ্বেলিত, তরঙ্গায়িত তার সৌন্দর্য্য!

শ্যামসুন্দর আকাশে সূর্য্যের অবস্থান দেখিয়া বলিলেন—দশটা হল বোধ হয়, চলুন একবার বাজারটা...

নিকুঞ্জ বলিলেন—তুমি বড্ড আ-দেখ্‌লা শ্যাম! পিতৃজন্মে বাজার কি কখনও দেখ-নি!

রাধাচরণ হাসিলেন।

শ্যামসুন্দর হাসিলেন না, গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া কহিলেন—তবে আর নামা কিসের জন্যে ছাই!

তুমি দেখে এস গে যাও বাপু, আমাদের দরকার নেই। বরং গেট থেকে দরওয়ানকে ডেকে নিয়ে যাও, কিছু কেনবার থাকে, কিনো। বাঁড়ুয্যে মশায়ের দরকার আছে না-কি কিছু বাজারে ?

গরীবের আবার বাজার কিসের মশাই! গাছের ফলটা-মাকড়টা,

ক্ষেতের ধান আর ঐ নদীর মাছ—তাইতেই কোন রকমে চলে যায়। বাজারের ধার বড় একটা ধারি নে।

শ্যামসুন্দর দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া গেলেন। নিকুঞ্জ ডাকিয়া বলিলেন—যদি ভাল মাছ পাও, নিজের জন্যে ত কিন্‌বেই জানি, বাঁড়ুয্যে মশায়ের জন্যেও এনো। ওঁর আজ সকালটাই পণ্ড করেছ জান ত!

শ্যামসুন্দর তাহাতেও রাজী। এখন চিন্তা, পাইলে হয়; বেলা অধিক না হইয়া থাকিলে হয়!

নিকুঞ্জ বলিলেন—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বাঁড়ুয্যে মশাই, বসুন!

রাধাচরণ বেঞ্চের ধারে বসিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

দুই চারিটা প্রশ্নে বংশ পরিচয়াদি বিবৃত হইয়া গেল। এমন কি উভয়ের অজ্ঞাতে ইহাও প্রকাশ হইয়া পড়িল যে উভয়ে পালটা ঘর এবং দুই ঘরের মধ্যে কাজ-কর্ম করা খুবই চলিতে পারে।

রাধাচরণ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, লোকটির একটি উপযুক্ত পুত্র আছে, বুঝি কেবলমাত্র রূপবতী একটি কন্যা লইয়া পুত্রটির বিবাহ দিবার সঙ্কল্প তাঁহার মনে জাগিয়াছে।

নিকুঞ্জ বলিলেন—বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের ছেলে মেয়ে ক'টি?

দুটি ছেলে একটি মেয়ে!

ঐ ছেলে দু'টি—বেঞ্চি—

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কাজ-কর্ম কি করা হয়?

গাঁয়ে আর কাজ-কর্ম কি হবে বলুন। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে টিকে দিই, যা বিশ পঁচিশ হয়, কষ্টেস্থষ্টে কেটে যায়। দু'বিঘে ভুঁই আছে, চাষ করি, চারটি ধান পাই! গোটাকতক কলা গাছ বাড়ীর পেছনটায় দেওয়া

আছে, তরকারীটা ঐ থেকেই হয়ে যায়। তবে কি জানেন নিকুঞ্জবাবু, এর ওপর অসুখ-বিসুখ বদ্দির খরচ থাকলে আর পারতুম না ; তা হলে প্রাণেই মরতে হত, ভগবান ঐটি দয়া করেছেন মশাই, গাঁটায় অসুখ-বিসুখ কম। তাইতেই ত লাটসাহেব...

নিকুঞ্জ মনে মনে লাটসাহেবের মস্তকটা চর্বণ করিতে লাগিলেন। কি কুক্ষণেই নির্বোধ লাটসাহেব এই হতভাগ্যের ব্যাঙের আধুলিটির সুখ্যাতি করিয়াছিলেন, কাণ পচিয়া গেল।

বেলা বাড়িয়া উঠিয়াছে দেখিয়া নিকুঞ্জ উঠিলেন, প্রস্থানকালে বলিলেন—খাওয়া-দাওয়ার পর ডাক্‌বাঙলোয় আস্‌বেন, কথা আছে।

আস্‌ব !

আমার মশাই দিবানিদ্রার বালাই নেই, যত শীঘ্র পারেন আসবেন। বিশেষ কথা আছে।

রাধাচরণ পুলকিত হইয়া বলিলেন—যে আজ্ঞে !

নিকুঞ্জ কমলের আবাস-স্থলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, ডাক-বাঙলোর বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুইয়া চিন্তামগ্ন হইলেন।

রাধাচরণ সারা মধ্যাহ্ন সেই স্বপ্নেই ভোর হইয়া রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বপ্ন কি সত্য হয়!

দুপুর বেলা কথাটা বলা হয় নাই। বলি বলি করিয়া নিকুঞ্জ অনেকবারই কথাটা প্রকাশ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, পারেন নাই। না পারিবার প্রধান কারণ, শ্যামসুন্দর আজ প্রকাণ্ড দুইটা রোহিত মৎস্য আনিয়া একটি বাঁড়ুয্যে ম'শায়ের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া, অন্যটার সুব্যবস্থায় এতই নিবিষ্টচিত্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে সারা দুপুর সে আহারই করিল না। স্বহস্তে মাছেরই তিন চারিটা তরকারী প্রস্তুত করিয়াছে, এখন চারিটা বেলায় মাছের টক চড়াইয়া গল্প করিতে বসিল।

রাধাচরণ মাঠ হইতে গাভীগুলিকে আনিতে হইবে বলিয়া বিদায় চাহিলেন, নিকুঞ্জ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কিয়দ্দূর পথ আসিয়া, সন্ধ্যাকালে রাধাচরণকে পুনরায় আসিতে মিনতি জানাইয়া বাঙলোয় আসিতে, দেখিলেন, শ্যামসুন্দর ভোজনে বসিয়াছেন।

বহুদিন এমন চর্বচুষ্য হয় নাই, শ্যামসুন্দর তাহা স্বীকার করিলেন।

নিকুঞ্জ জিজ্ঞাসিলেন—এবার কি করবে হে?

যা বলবে, রাজী আছি!

নিকুঞ্জ ভয়ে ভয়ে বলিলেন—শোবে না?

খেয়েদেয়ে একটু শুতে হবে বৈ-কি!

তহলেই ত সন্ধ্যে!

হোক্ সন্ধ্যে।

বেরুবে না?

শ্যামসুন্দর একমিনিট ভাবিয়া বলিলেন—কাল সকালেই বেরুনো যাবে না-হয়! কালকের দিনটা না-হয় এখানেই থাকা যাক্!

কেন, বাজারটা খুবই পছন্দ হয়েছে বুঝি?

শ্যামসুন্দর হাসিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

বলিলেন—অনেকদিন জলবাস করে প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছে দু'দিন স্থলবাস করা যাক্!

মন্দ কি!

মুখ শুদ্ধিটা মুখে দিতে যা বিলম্ব, শ্যামসুন্দর শয্যা গ্রহণ করিলেন। মধ্যাহ্নেই বোট হইতে ভৃত্যগণ আসিয়া শয্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল।

রাধাচরণ সন্ধ্যার পর একটি অপরিষ্কৃত ডীজ লণ্ঠনের ঘোলাটে আলোয় পথ চিনিয়া বাঙলোয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নিকুঞ্জ বলিলেন—আপনার ভাইঝিটির বয়স কত বাঁড়ুয্যে মশাই?

রাধাচরণ একটু মুস্কিলে পড়িয়া গেলেন। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীটি ষোড়শবর্ষ অতিক্রম করিতে চলিয়াছে কিন্তু সে-কথাটা অন্যের কাছে বলা যুক্তি সঙ্গত কি-না রাধাচরণ সহসা স্থির করিতে পারিলেন না। অথচ মিথ্যা বলিতেও প্রবৃত্তি নাই। একটু ভাবিয়া বলিলেন—এই পনের ষোলই হবে।

লেখাপড়া জানে?

কথামালা পর্য্যন্ত। তবে সংসারের কাজে-কর্মে সুশীলা বড় লক্ষ্মী।

মেয়েটির নাম বুঝি—সুশীলা?

নিজের মুখে বলা ঠিক হবে না, শুধু নামে নয়, সত্যিই সুশীলা।

নিকুঞ্জ চুপ করিয়া রহিলেন। মানস চক্ষে যে অপরূপ লাবণ্যময়ীর

স্নিগ্ধ উজ্জ্বল মূর্ত্তিখানি ভাসিতেছিল, তাহার যে অন্য কোন নামই শোভন হয় না, তাহাই তিনি মনে মনে বিচার করিতেছিলেন।

রাধাচরণ বলিলেন—দেখতে শুনতেও সুশীলা আমার খুবই ভাল কিন্তু—

কিন্তু কি?

দারিদ্র দোষ বড় দোষ, নিকুঞ্জ বাবু!

এক মিনিট পরে নিকুঞ্জ কহিলেন—কি রকম পাত্রে আপনারা কন্যা-দান করতে চান, বাঁড়ুয্যে মশাই?

দু'টি খেতে পরতে পেলেই হল দাদা! তার বেশী আর কিছু চাইনে।

এই?

তাছাড়া আর কি বলব বলুন। পয়সা কড়ি নেই, দিতে ত পারব না, শুধু মেয়েটিকে কেউ নিয়ে যায়, খেতে পরতে দেয়, যত্ন করে, এই!

নিকুঞ্জ নীরব।

দ্বারবান প্রকাণ্ড সেলাম করিয়া সবিনয়ে কহিল, দুইজন সশস্ত্র প্রহরীর সারারাত্রি বাঙলোয় থাকিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, দ্বারবান স্বয়ং এখানে থাকিতে পারিবে না, কারণ বোট আগলান দরকার তবে প্রহরে প্রহরে সে বন্দুকের শব্দ করিবে, ইহারাও আওয়াজ করিয়া তাহার উত্তর দিবে!

নিকুঞ্জ 'বন্দোবস্তে' খুশী হইয়া তাহাকে বিদায় দিলেন

রাধাচরণ জিজ্ঞাসিলেন, আজ কি এখানেই থাকা হবে?

নিকুঞ্জ হাসিয়া বলিলেন—আজ্ঞে হাঁ এখানেই। অনেকদিন মশাই জল-ভ্রমণ করেছি, প্রাণ খাবি খাচ্ছিল, আজ হারাণ প্রাণ ফিরে পাওয়া গেছে। কিছুদিন আর নড়ছি না।

রাধাচরণ বলিলেন—ভালই ত!

নিকুঞ্জ হঠাৎ রাধাচরণের একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—রাধাচরণ বাবু, আপনার ভাইঝির বিয়ের ব্যবস্থা আমি করব, আপনি অনুমতি দিন।

রাধাচরণ পল্লীগ্রামের লোক ; বুদ্ধি বিবেচনা সবই সরলরেখায় অবস্থিত ; নিকুঞ্জের অনুমতি প্রার্থনার কারণ বুঝিতে না পারিয়া হতভম্বের মত বসিয়া রহিলেন।

নিকুঞ্জ হাত খানার উপর একটু জোরে চাপ দিয়া বলিয়া উঠিলেন রাধাচরণ বাবু, আমার কথাটা আপনাকে রাখ্‌তেই হবে। স্বীকার করুন।

রাধাচরণ অতি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কোন কথাই তলাইয়া বুঝিবার মত মানসিক অবস্থা সে সময়ে তাঁহার ছিল না, বলিলেন—তার আর কি বলুন। আপনি যা করবেন আমাদের পক্ষে সে নিশ্চয়ই খুব ভাল হবে।

নিকুঞ্জ সে কথার কোন উত্তর দিলেন না। রাধাচরণের হাতটি ছাড়িয়া দিয়া প্রজ্বলিত আলোকটির দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

রাধাচরণ আকুল আগ্রহে কথাটার শেষ শুনিবার আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন ; কোন কথা না শুনিয়া আকাশ পাতাল চিন্তায় মন দিলেন। সেই ভাবী পাত্রটি কে ? নিকুঞ্জ বাবুর পুত্র ? দৌহিত্র ? ভ্রাতা না আত্মীয় ? সেও কি এইরূপ ধনবান, সৌভাগ্যবান ? তাহারও কি সিপাহী শান্ত্রী খোলা তলোয়ার হাতে, বন্দুক ধরিয়া থাকে ? তাহারও কি অমনি সুসজ্জিত তরণী আছে ? এত ভাগ্য কি সুশীলার হইবে ? বিধাতা কি তাহার অদৃষ্টে এত সুখসৌভাগ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ? আহা, অতি ছোট বেলায় সুশীলা বাপকে হারাইয়াছে, বার বছর পর্য্যন্ত

রাধাচরণকেই সুশীলা বাবা বলিয়া জানিত, ডাকিত ; অতি কষ্টে তাঁহারা সুশীলার এই ভুল ভাঙ্গাইতে পারিয়াছেন। তবুও এখনও মাঝে মাঝে কথার মধ্যে ভুল করিয়া সুশীলা ধমক খায়। সে ত বলেই বাপ কাকা কি আলাদা? আহা, সেই সুশীলার উপর ভগবানের কি এত দয়া হইবে?—রাধাচরণের দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। রাধাচরণ ভাবাতিশয্যে আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, ছলছল চোখে নিকুঞ্জের মুখের পানে চাহিয়া উদ্বেল-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন—দাদা আমার সুশীলার কি সে ভাগ্য হবে যে আপনার--

নিকুঞ্জ গাঢ়স্বরে বলিলেন—রাধাচরণ বাবু, আমার ঘর বহুদিন অবধি শূন্য। আপনার সুশীলাকে দিন, আমার খালি ঘরের সোনার সিংহাসনে বসিয়ে তাকে পূজো করি।

এ কথার অর্থ কি? পূজো—কেন? রাধাচরণের বুদ্ধি ছিল না বা বিকৃত হইয়াছিল জানি না, তিনি একটি অক্ষরও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না।

নিকুঞ্জ অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। কথাটা বলিবার ইচ্ছা বহুক্ষণ হইতেই ছিল কিন্তু লজ্জা তাঁহার মুখ খুলিতে দেয় নাই, বলিবার পরও লজ্জা গেল না। প্রকাশের লজ্জা তাঁহার সর্ব অঙ্গে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। নিকুঞ্জ নীরবে, নতনেত্রে বসিয়া রাধাচরণের উত্তর প্রত্যাশা করিতেছিলেন।

রাধাচরণ বলিলেন—নিকুঞ্জ বাবু, বলুন দয়া করে, এ আমি বিশ্বাস করি।

নিকুঞ্জ বলিলেন—সত্যি বলছি, আপনি সুশীলাকে আমায় দিন রাধাচরণ বাবু। আমার কাছে তার অযত্ন হবে না!

রাধাচরণ মুহূর্তের জন্য নির্বাক হইয়া গেলেন।

অমত আছে ?

রাধাচরণ নিরুত্তর।

অমত থাকে, বলুন, চলে যাই। আবার নৌকায় উঠি! স্থলের মুখ আর দেখ্‌ব না। বলুন রাধাচরণ বাবু, আপনার কথার ওপরই আমার জীবন নির্ভর করছে! না দেন, জোর ত নেই, আজই রাত্রে বোট ভাসিয়ে চলে যাই ?

রাধাচরণ স্থবির।

নিকুঞ্জ গাঢ়স্বরে বলিতে লাগিলেন—আপনি হয়ত বললে বিশ্বাস করবেন না রাধাচরণ বাবু!—এই ত একটি দিন ক'টিবার সুশীলাকে আমি দেখেছি কিন্তু সে আমার মনে আঁকা হয়ে গেছে, অহরহ এই চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছে!

রাধাচরণ গদগদ কণ্ঠে কহিলেন—সুশীলার মা আছেন।

নিকুঞ্জ অনেক খানি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য; পুনরায় উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া বলিলেন—আপনি ত তার কাকা, অভিভাবক!

কিন্তু তার মার ঐ এক মেয়ে।

নিকুঞ্জ চেয়ার খানার পিঠে এলাইয়া পড়িয়া বলিলেন—আপনি তাঁকে বলবেন ?...

রাধাচরণের মুখটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল—বলবো না! নিশ্চয় বলব, আজই বলব!

কাল সকালে এখানে আস্‌বেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তখন শুন্‌তে পাব ?

রাধাচরণ ঘাড় নাড়িলেন।

নিকুঞ্জ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে রাধাচরণকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন—বলবেন রাধাচরণ বাবু, ছেলে নেই, মেয়ে নেই, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, অনেকদিন বড় দুঃখে জীবন কেটেছে, হয়ত শেষ পর্য্যন্ত কেটে যেতও, একদিনে, একমুহূর্ত্তে সুশীলা জীবনের ধারা ফিরিয়ে দিয়েছে। এখন জীবন মরণ আপনার হাতে! বাঁচান বাঁচবো, না বাঁচান, মরবো। তবে এ কথা ঠিক এ বয়সে এত চঞ্চলতা এক দিনের জন্যও অনুভব করিনি রাধাচরণ বাবু আজকের আগে, সুশীলাকে দেখ্‌বার আগে। মনে থাকবে রাধাচরণ বাবু?...নিকুঞ্জের কণ্ঠ মধ্যে অশ্রুর আভাষ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

রাধাচরণ আবেগ-ভরে বলিলেন—আমাকে অত করে বলছেন কেন নিকুঞ্জ বাবু!

নিকুঞ্জ দাঁড়াইয়া উঠিলেন, বলিলেন—কাল সকালেই আসছেন?

সকালেই আসব।

রাধাচরণকে বিদায় জ্ঞাপন করিতেই নিকুঞ্জ দাঁড়াইয়া উঠিয়া ছিলেন, রাধাচরণ তাহা বুঝিয়াই বলিলেন—আচ্ছা এখন তা হ'লে আসি!

দাঁড়ান!—নিবারণ!

নিবারণ, বাবুর খানসামা।

নিকুঞ্জ বলিয়া দিলেন, দরয়ানকে বল্ আলো ধরে বাবুকে পৌঁছে দিয়ে আসুক।

রাধাচরণ হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—আমাদের সঙ্গে লোক লাগে না নিকুঞ্জ বাবু! আর আমার সঙ্গে আলো আছে।

তা থাক্, বলে দে নিবারণ!

নমস্কার, সকালেই আস্‌ব।

নমস্কার!

4।7

রাধাচরণ ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন, এখন তাঁহার কর্ত্তব্য কি? নিকুঞ্জের বয়স হইয়াছে, পঞ্চাশের উপর—তা হইবে বৈ-কি! তবে অতুল ঐশ্বর্য্যবান! ছেলে-পুলে নাই, সে হিসাবে মন্দ নয় কিন্তু চুল গুলি সবই সাদা; পঞ্চাশ বছর এমন গর্ত্তব্য নয় বটে কিন্তু যেরূপ দিনকাল চলিতেছে তাহাতে পঞ্চাশটাকে না ধরিতেও ত সাহস করা যায় না! রাধাচরণ এমন সমস্যায় আর পড়েন নাই। যখন পাত্রাভাবে সুশীলার বিবাহ দিতে না পারিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন, সে সমস্যা তখনও এরূপ জটিল হইয়া উঠে নাই। তখন যদিও রোজ মনে হইত, যে কোন রজনী-শেষে দ্বার খুলিয়া যে কোন ব্রাহ্মণ-সন্তানকে দেখা যাইবে তাহারই করে কন্যাদান করিতে হইবে,...তা সে যুবাই হোক, বৃদ্ধই হোক আর বালকই হোক, কোন বিচার করিব না; অর্থবান হোক অথবা ভিক্ষুকই হোক জানিতেও চাহিব না...তখনও তিনি এমন কঠিন সমস্যায় পড়েন নাই, আজ যেমন পড়িয়াছেন।

নিকুঞ্জের আজ আর শ্যামসুন্দরের সঙ্গ ভাল লাগিল না। একবাটী সাগু, দুই টুকরা সেঁকা রুটি, একগ্লাস নেবুর রস এই ছিল নিকুঞ্জের রাত্রের আহার। সকাল সকালই তাহা শেষ করিয়া ডাক্ বাঙলোর বড় ঘরখানিতে নেয়ারের খাটের উপর শুইয়া আলো নিবাইয়া দিতে বলিলেন।

আলোর আজ কোন প্রয়োজন ছিল না। আজ বিশ্বের আঁধার আলো হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; আকাশে আজ আলোর বন্যা ছুটিতেছে, ধরা আজ আলোকতরঙ্গে স্নান করিয়া আলোকময়ী হইয়াছে, আজ আঁধারে আলো, গাছের মাথায় লক্ষ হীরার আলো প্রজ্বলিত; এই আঁধার ঘর আলোয় ভাসিতেছে, আর সব চেয়ে আলো জ্বলিয়াছে যুগ যুগান্তের অন্ধকার-ঘেরা, বর্ণহীন, বিশেষত্বহীন, বৈচিত্র্যহীন এই আঁধার-মগ্ন মনটির মধ্যে!

সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকের মাঝখান দিয়া আলোকরাণীর মত সুশীলার স্নিগ্ধ সুন্দর দেহখানি পুষ্পিতা লতার মত হেলিয়া দুলিয়া সুবাস বিতরণ করিয়া বেড়াইতেছে। চরণে তাহার শত নূপুরের ঝঙ্কার উঠিতেছে, মুখের মৃদু হাস্য তাহার শত শত শুভ্র ফুলের হাসি ছড়াইতেছে, সুশীলার অপরূপ দেহভঙ্গিটি নিমেষে শিল্পীর শিল্পজ্ঞানকে ধিক্কার দিতেই শত চিত্রের বিকাশ করিতেছে!

সেই টানা সূক্ষ্ম ভ্রু, সেই আয়ত দৃষ্টি, সেই গৌরসুন্দর মুখ খানি এ জগতে এক সুশীলারই। এমন ভ্রূ আর কেহ পায় নাই, এমন দৃষ্টি স্রষ্টা নির্জনে গড়া সুশীলাকেই দিয়াছেন, এ মুখ যে স্রষ্টার নিজের পরিকল্পনা। তাহার কি তুলনা আছে?...নিকুঞ্জ সারারাত স্বপ্নে তুলনা খুঁজিয়া হতাশ হইয়া ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মত আছে

ছোট্ট একখানি ভাঙ্গা ঘর।

ঘরের কোণে মাটীর ডেল্‌কোর উপর রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছে, বাতাস আসিয়া ক্রমাগত তাহার ক্ষীণ আলোক রেখাটিকে কাঁপাইয়া দিতেছিল। ঘরের একদিকে একখানা তক্তাপোষ, তাহার উপরে একটি দৃঢ় বলিষ্ঠ যুবক বসিয়া।

মাটীতে বসিয়া সুশীলা পাণের বাটা বাহির করিয়া পাণ চিরিতেছে আর গল্প বলিতেছে, অদূরে বসিয়া সুশীলার মা মালা জপিতেছেন ও তন্ময় হইয়া মেয়ের কথাগুলি গ্রাস করিতেছেন।

সুশীলা বলিতেছিল, একটা কামরায় কেবল ছবি...বুঝলে নগুদা! কত রকম-বেরকমের যে ছবি সে আর তোমায় কি বল্‌বো! আর একটা কামরায় বুঝলে মা, এই দেওয়ালময়, তলোয়ার বর্শা, শড়কী, এই সারিসারি বন্দুক!"—সুশীলা শিকারীর বন্দুক ধারণের মত ভঙ্গীতে দক্ষিণ হাতটি মাতার দিকে প্রসারিত করিয়া ধরিল।

তাহার জননী ও নগেন্দ্র উভয়েই হাস্য করিলেন।

সুশীলা হাতটি নামাইয়া লইয়া, লজ্জারাঙা মুখে বলিল—তোমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না, না-মা? তা বাপু, কাল আমার সঙ্গে যেয়ো, দেখিয়ে আনব। তুমি ত নিজেই যেয়ে দেখে আসতে পার নগু-দা!

নগু হাসিয়া বলিল—দেখে ত আমার পাঁচটা হাত বেরুবে কি-না!

সুশীলা মুখখানি বাঁকাইয়া বলিল—লোকে বুঝি পাঁচটা হাত বেরুবার জন্যেই সব দেখে?

নগেন্দ্র উত্তর দিল না ; হাসিয়া নিজের উক্তি সমর্থন করিল।

সুশীলা বলিল—এই যে পশু দে-পাড়ার মেলা দেখ্‌তে ছুটে গেছলে মশাই, সে বুঝি পাঁচটা হাত বের করবার জন্যে যাওয়া হয়েছিল।

সে মেলা!

শুধু ভিড়, ঠেলাঠেলি আর পাঁপড় ভাজা, এই দেখ্‌তেই ত ছুটেছিলে!

সে আর এ!

সুশীলা ভুৎপিত স্বরে বলিল—তা সত্যি! সে আর এ! এখানে যা আছে তা কখনও দেখেছে কেউ!

মেয়ের মা হাসিয়া বলিলেন—আর কেউ না দেখেছে আমার সুশীলা-মণি ত দেখেছে, তাহ'লেই হল।

সুশীলা রাগ করিয়া বলিল—হ'লই ত! তেমন সব জিনিস দেখতে পাওয়া ভাগ্যের কথা!

নগেন্দ্র সহাস্যে কহিল—পুণ্যি হয়—দেখ্‌লে?

সুশীলা ঠকিবার মেয়ে ছিল না ; বলিল—মেলা দেখ্‌লে ত হয়।

মেলায় ঠাকুর আছে ; তা দেখ্‌লে পুণ্যি হয়!

আর কথা সুশীলার মুখে জোগাইল না, পাণের চিলতাকটিকে সাজাইতে সাজাইতে বলিল—সব কাজই কেবল পুণ্যির জন্যে লোকে করে কি না!, চিড়িয়াখানা দেখতে কলিকাতায় যায়—পুণ্যি করতে; সোসাইটি দেখে পুণ্যি হবে বলে ; থিয়েটার দেখে...পুণ্যির জন্যে! কি আমার পুণ্যি গো!

নগেন্দ্র অল্প কয়েকদিন পূর্বে কলিকাতায় গিয়া উক্ত অপকর্মগুলি সম্পন্ন করিয়া আসিয়া সবিস্তারে ইহারই নিকট গল্প করিয়াছিল। সে সময়ে সুশীলা হাঁ করিয়া শুনিয়াই গিয়াছিল, আজ ঠিক সময়ে সুদশুদ্ধ সেগুলার সদ্ব্যবহার করিল। প্রত্যেকটি এমন ভাবে প্রয়োগ করিল

যে তদ্দারা নগেন্দ্রের মন অনেকখানি দমিয়া গেল। নগেন্দ্র কোন কথা বলিল না।

সুশীলার মা এই দুইটি 'বালক বালিকা'র মনের দ্বন্দ্ব ঘুচাইয়া দিতেই বলিলেন—নগু, সকালে তুমি এস ত বাবা একবার, সুশীলার মনের বাসনাটা মিটিয়েই দেব, জাহাজ দেখে এসে!

জাহাজ তোমাকে কে বলেছে মা?

ওমা! তুই কি মেয়ে লা সুশীলা! এই ত তুই বল্লি, কালনা শান্তি-পুরের জাহাজও অনন সাজান নয়।

তা ত নয়ই। তাই বলে জাহাজ কখন বল্লুম! বেশ লোক ত তুমি!

মাকে মৃদু মৃদু হাসিতে দেখিয়া সুশীলার বড় রাগ হইল; সে হুতাশন-বৎ জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—ব্যগ্রতা করি না তোমার, দেখে আমার মাথা কিনতে তোমায় হবে না! জাহাজ হোক্, ভাউলে হোক, ডিঙ্গি, সালতি যা খুসী তাই হোক্, আমাদের কি!

সে ঘস্ ঘস্ করিয়া পাণের চিলতায় আঙুল ঘসিতে লাগিল।

নগেন্দ্র হাসিয়া বলিল—অত করে চুণ দিও না সুশীলা, গাল পুড়ে যাবে।

সুশীলা পাণের দিকে চাহিতেই নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া যে পরিমাণ লজ্জা পাইল, নগেন্দ্রের টিটকারীতে ততোধিক রুষ্ট হইল। পাণের বাটাটাকে খং করিয়া সরাইয়া দিয়া, ঝড়ের মত দাঁড়াইয়া উঠিয়া ভাঙ্গা-গলায় বলিল—পারব না আমি পাণ সাজতে! যার খুশী সে দিক সেজে!

বলিয়া সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সুশীলার মা একবার রোষ-কম্পিতা মেয়ের পানে আর একবার হাস্যপরায়ণ নগেন্দ্রের পানে চাহিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হরিনামের মালাটি খুলিয়া মাথায় ঠেকাইয়া, একটা

পেরেক ঝুলাইয়া দিয়া, পাণের বাটাটাকে টানিয়া পাণে চুণ দিতে লাগিলেন। মুখখানি, চোখ দু'টি সেই স্বল্পালোকিত কক্ষেই হাসি ছড়াইতেছিল কিন্তু ভগবান জানেন, বাহিরের জগৎ যখন রবিকরোদ্ভাসিত হইয়া সৌন্দর্য্য-শ্রীতে ভরিয়া গিয়াছে, অন্তর তখন কি এক গাঢ় বিষাদ কালিমায় কালো, শ্রীহীন, রসহীন, কুৎসিৎ হইয়া উঠিতেছিল। এমন সৌন্দর্য্য, এত স্নেহ, এত সারল্য, এই অভিমান—সব বৃথা, সব বৃথা!

নগু হাসিয়া বলিল—সুশীলা ভারি রেগেছে, না পিসীমা!

সুশীলার জননী নীরবে ঘাড় নাড়িলেন।

নগু তক্তাপোষ হইতে নামিয়া সুশীলাকেই ডাকিতে যাইতেছিল, অঙ্গনে মনুষ্যপদশব্দ শ্রুত হইল; পরমুহূর্ত্তেই রাধাচরণ একহাতে ভাঙ্গা চিড় হ্যারিকেনটি অন্য হাতে সুশীলার হাত ধরিয়া ঘরে ঢুকিয়া, বলিলেন—পাগলী ক্ষেপালে কে? নগু বুঝি!

নগু হাসিয়া বলিল—আমি না কাকা; নিজে নিজেই!

সুশীলা এতক্ষণ গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এই কথায় চট্ করিয়া চটিয়া উঠিয়া বলিল—নিজে নিজেই! বলুক-না মা, নিজে নিজেই কেমন!

রাধাচরণ সুশীলার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন—তুই ক্ষেপিস্ কেন বল ত সুশীলা! যা খুশী লোকের বলুক-না, তুই কেন তাতে রাগ করবি! বল্লে—বল্লেই! যখন নিজেরাই বুঝবে যে তোকে রাগান সহজ নয়, তখন মুখ ব্যথা আর করবে না। তা, কি নিয়ে আজ হোল—বল্ ত সুশীলা! কথামালায় সেই 'একটা হাড়ের গলায় বাঘ ফুটিয়াছিল'—তাই নিয়ে নাকি?

কাকাবাবু, আপনিও!—রাগে-অভিমানে সুশীলা রাধাচরণের হাত ছাড়াইয়া পলায়নের উদ্যোগ করিল। হতভাগিনী একদিন পাঠ আবৃত্তি

করার সময়ে বাঘের গলায় হাড় বলিতে গিয়া হাড়ের গলায় বাঘ বলিয়া ফেলিয়াছিল !

রাধাচরণ হাতটা ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—বোস্ মা-সুশীলা, কথা আছে !

রাধাচরণ বসিলেন। সুশীলার জননী ছোট একটি ডিবার খোলে করিয়া তুইটা পাণ তাঁহার সামনে রাখিয়া দিয়া বলিলেন—তোমার সঙ্গে যে জমিদার বাবুটির বন্ধুত্ব হয়েছে, সুশীলা কখন্ ঘাটে জল আন্‌তে গিয়ে তাঁর বোটখানার ভেতর দেখে এসেছে, আমাদের তু'জনকে না দেখালে ওর চল্‌ছে না—এই নিয়ে বেঁধেছিল নগুর সঙ্গে !

রাধাচরণ এই প্রসঙ্গটাকে পরম রুচিকর মনে করিলেন। সুশীলার পিঠে হাত দিয়া স্নেহ কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন—বোটের ভেতর তুই দেখ্‌লি কেমন করে সুশীলা ?

কেন কাকাবাবু ! বন্দুক ধরে যে সেপাইটা সঙের মত আমার দিকে চেয়েছিল তাকে বল্লুম, ভিতর দেখায়-দে গা ? সে বল্লে-আলবৎ, আইয়ে। আমি পাড়ে কলসী রেখে গেলুম, সে সিঁড়ি ফেলে দিলে, উঠলুম। চমৎকার সাজান কাকাবাবু, আপনি দেখেছেন ?

রাধাচরণ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—খুব ভাল সাজান বুঝি ?

খু-উ-ব ভাল কাকাবাবু।

তা আর হবে না। লোকটাও ত যে সে নয়! বাগবাজারের নিকুঞ্জ মুখুয্যে ওর নাম, মস্ত বড় লোক।

সুশীলা উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিতে লাগিল—দোরে দোরে মুক্তোর পর্দা, দেওয়ালে দেওয়ালে সোণা বাঁধানো ছবি, আপনি কাল দেখে আস্‌লেন কাকাবাবু।

যাব-মা। আর কি দেখ্‌লি সুশীলা ?

কত কি দেখ্লুম কাকাবাবু। একটা ঘরের দেওয়ালে জামার বোতামের মত একটা কি রয়েছে, সে'টা কট্ করে টিপে দিলেই আলো জ্বলে ওঠে। আবার কট্ করে টিপ্‌লে আলো নিবে যায়।

রাধাচরণ হাসিয়া বলিলেন—ইলেকট্রি আলো।

তেমনি আর একটা বোতাম টিপ্‌লে পাখা ঘোরে...

হ্যাঁ। ইলেকট্রি পাখা বলে তাকে। নৌকোর মধ্যে ও-সব রাখা বড় চাট্টিখানি কথা নয়।

সুশীলা এতক্ষণে জননী ও নগেন্দ্রকে বাগে পাইয়াছে, বিনাইয়া বিনাইয়া বেশ দু' কথা শুনাইয়া দিল।

আমি তাই ওঁদের দেখে আস্‌তে বল্‌ছিলুম, তা ওঁরা হেসেই অজ্ঞান; বলেন, দেখলে কি পাঁচটা হাত বেরুবে।

পাঁচটা হাত বেরুলে যে আনন্দ হবে, এ সব দেখলে তার চেয়ে বেশী আনন্দই হবার কথা।

সুশীলার মা বলিলেন—বোট আছে ত। কাল একবার সকালে দেখেই আসব—ছাই! মনিষ্যি জন্মের দেখা, দেখে নেওয়াই ভাল।

নগেন্দ্র তখনও অপরাজিত; সুশীলার বুকটা তখনও থর্ থর্ করিতেছিল; সে পূর্বের মত উৎসাহে দীপ্ত হইয়া বলিতে লাগিল—একটা ঘর আছে কাকাবাবু, কেবল শ্বেত পাথর ঢাকা। তার জান্‌লা পাথরের, টেবিল চেয়ার, খাট সব সাদা পাথরের—সেই ঘরটায় বাবু শোয়, সেপাইজী বল্লে।

সেপাইজীর সঙ্গে তোর ভাব হয়েছে না-কি সুশীলা?

হুঁ—উ। সে বেশ লোক। সে আমায় জিজ্ঞেস্ করছিল, পিঠে কব হোগা? আমি বল্লুম—পোষ মাসে। বল্লে-কত দেরী? বল্লুম

অনেক দেরী আছে। শুনে বল্লে, আগে হয় না মায়ি? খোট্টার বুদ্ধি কিস্যু। ভেবেছে পিঠেপুলি বুঝি যখন-তখনই হয়।

রাধাচরণ হাসিলেন, বলিলেন—তা তুমি ত এক কাজ করলেই পারতে সুশীলা। সেপাইটাকে পিঠেপুলি খাবার নেমন্তন্ন করে এলেই পারতে। সকালে ওদের দেওয়া অত বড় মাছটা খেলে, না-হয় দু'টো পুলি গড়ে খাওয়াতে।

মাকে আমি বলেছিলুম কাকাবাবু! মা হাস্‌লে, বল্লে—হয় না!

রাধাচরণ বলিলেন—খুব হয়। কত কটাই বা চাল দরকার। কাল তুমি সকালেই সেপাইজীকে নেমন্তন্ন দিয়ে এস।

আচ্ছা কাকাবাবু, সকালেই জল আন্‌তে গিয়ে বলে আসব। মা'ও ত কাল যাবে, না মা?

নগেন্দ্র বলিল—বল্‌তে হয়, আমি বলে আস্‌ব, তোমাদের যেতে হবে না। কে কোথাকার সেপাই, তার ঠিক নেই।

রাধাচরণ নগেন্দ্রের মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন—সুশী-মণিকে মায়ী বলে ডেকেছে শুন্‌লে না? আমার সুশী-মার ছেলে সে।

নগেন্দ্রের মুখ ছোট হইয়া গেল এবং পষ্টই দেখা গেল, সুশীলার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সুশীলার মা পাণের বাটা হইতে দুইটা পাণ নগেন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিয়া, রাধাচরণের উদ্দেশে কহিলেন—পরাণ গরাইকে বাঁশবেড়ে পাঠাতে পারলে ঠাকুরপো?

তা ত পাঠালুম বৌ-ঠাণ। এ-দিকে...

অসমাপ্ত কথাটার মধ্যে কি যে নিহিত আছে বুঝিতে না পারিয়া অনিশ্চিত আশঙ্কায় জননীর বুকখানি কাঁপিয়া উঠিল। তবে কি সেখান হইতে সেই-চির-পরিচিত না-ই আসিয়া গিয়াছে!

উৎকণ্ঠিতমুখে বলিলেন—পরাণ ফিরে এসেছে না-কি ঠাকুরপো ?

রাধাচরণ বলিলেন—না। এই ত বিকেলে গেল।

তবে ?

তবে যে কি—রাধাচরণও তাহাই ভাবিতেছিলেন, উত্তর দিলেন না।

সুশীলার মা'র উদ্বেগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল, তিনি আর ক্ষণকালও থাকিতে পারিতেছিলেন না, অশ্রুসজলকণ্ঠে বলিলেন—বল না ঠাকুরপো, এত দিন সহ্য হয়েছে—আজ আর হবে না, বল। কিছু খারাপ খবর পেয়েছ বুঝি ? তারা রাজী নয় ?

প্রসঙ্গটা কিসের বুঝিয়াই সুশীলা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সেখানে তখন আর তাহার নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না ; সে উঠিবার উপক্রম করিতেই রাধাচরণ তাহার হাত ধরিয়া বসাইয়া দিয়া বলিলেন—বোস্ মা সুশীলা। আমি যা বলব, তোরও শোনা দরকার। নগেন, তুমিও বস বাবা, পরামর্শ চাই।

আতঙ্কে, বিস্ময়ে সুশীলার মার মনখানি ঝড়ো বাতাসে কলাপাতার মতই উলটি-পালটি কাঁপিতেছিল। কোন গুরুতর ঘটনার সূত্রপাত বুঝিয়া তিনি নিঃশব্দে অন্তরযামীকে ডাকিতে লাগিলেন।

রাধাচরণ গম্ভীরভাবে বলিলেন—বৌ-ঠাণ, সুশীলার বর ভগবান পাঠিয়েছেন। স্বয়ং ভগবান।

সুশীলার মা'র মনের মধ্যে যে বাতিটা বহুদিন যাবৎ নির্বাপিত ছিল, আজ এই সংবাদে বিদ্যুৎ-বলে যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সুশীলা মাথাটি নীচু করিয়া লইল ; আর সকলের অলক্ষ্যে নগেন্দ্রের বুকটা দুড় দুড় করিয়া উঠিল।

রাধাচরণ বলিতে লাগিলেন—ধনে, মানে, ঐশ্বর্য্যে লক্ষ লোকের

একটি। বৌ-ঠাণ, আমরা যা কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি, ভগবান না-সুশীলার প্রতি দয়া করে' তেমন বরই পাঠিয়েছেন। এখন আমাদের বরাত।

সুশীলার মা কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—বাঁশবেড়ের সে ছেলে নয় ঠাকুরপো?

না।

এ তবে কোথাকার ঠাকুর পো? তোমার কথা শুনে যে আমার বড় ভয় হচ্ছে ভাই। আমাদের ঘরে এ সব কি কথা ভাই?

সত্যিই তাই বৌ-ঠাণ। কিন্তু জানই ত ভগবান দয়াময়; তাঁর দয়া হলে না-হতে পারে কি।

তা আর জানিনে ভাই।—নারী ঘন-ঘন চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

রাধাচরণ বলিলেন—দোজবরে, বৌ-ঠাণ।

তা আর কি হ'বে বল ভাই। দু'টা বছর ঘুরছ, দেখ্‌লে ত। তা' ছেলে-মেয়ে কি আছে শুন্‌লে?

কিছু না।

মা মেয়ের নত মুখখানির দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—তবে আবার দোজবরে কিসের! ছেলে-মেয়ে থাকৃত ত বলতুম দোজবরে। কোন কাঁটাই ত নেই তাহ'লে।

মা বড় আশা করিতেছিলেন, মেয়ের মুখ হইতে না হোক, ভাবে-ভঙ্গিমায় এই কথার সমর্থন তিনি পাইবেন কিন্তু সে-যে সেই মাটীতে চোখ রাখিয়া নিশ্চল মৃন্ময়ী মূর্ত্তিটির মত বসিয়া আছে, সাড়াও নাই, শব্দও নাই, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, বুঝি তাহার সংজ্ঞাও নাই।

কোথায় বাড়ী?

কলকাতায়।

জননী উৎফুল্লকণ্ঠে কহিলেন—রাখাল খবর এনেছে বুঝি! আজ শনিবার?

রাধাচরণ বলিলেন—না, আজ বুধবার। রাখাল আনে-নি; পাত্র স্বয়ং এসেছে।

গাঁয়ে?

হ্যাঁ।

কোথায় ঠাকুরপো? কাদের বাড়ীতে ভাই? সে কি আমার সুশীলাকে দেখেছে?

দেখেছে। দেখে বড়ই মনে ধরেছে, আমাকে ডেকে পাঠিয়ে খবর দিলে!

একি জাগ্রত স্বপ্ন? না মরুভূমে মরীচিকা। পাত্র স্বয়ং আসিয়াছে, কন্যাকে দেখিয়া খবর পাঠাইয়াছে। ইহা যে স্বপ্নের মতই অলীক, অসত্য! সুশীলার মা'র বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়িতেছিল, উদ্বেগাকুলকণ্ঠে কহিলেন—কার বাড়ীতে এসে আছে ঠাকুরপো?

ডাক্-বাঙ্লোয়!

সুশীলা সর্পদ্রষ্টার মত মাথাটা তুলিয়া তখনই নামাইয়া লইল।

তাহার জননী নির্বাক, নিস্পন্দ!

নগেন্দ্র বলিল, সেই বুড়োর সঙ্গে সুশীলা! মানাবে ভাল পিসিমা! এক ঘাটের মড়া...

যেন এ প্রসঙ্গের সহিত তাহার নিজের কোন সম্পর্ক নাই এই ভাবে সুশীলা নগেন্দ্রের অভদ্র কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—ভদ্দর লোককে গাল দিলে খুব বড় কাজ করা হয়, না?

মেয়ের মা, কাকা, নগু সকলেই গভীর বিস্ময়ে সুশীলার দিকে চাহিলেন; পদদলিতা ফণিনী বিষ উদ্গীরণ করিয়া যেভাবে শ্রান্ত মস্তক

নমিত করিয়া লয়, সুশীলাও সেই ভাবে লজ্জাকৃষ্ট মাথাটা নামাইয়া লইল।

নগেন্দ্র দিক্‌বিদিক জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছিল। বলিল—ঘাটের মড়া নয় ত কি! আজ বাদে কাল তারকব্রহ্ম নাম শোনাতে হবে যার কাণের ওপর মুখ রেখে, তার সঙ্গে...

রাধাচরণ বলিলেন—না নগু, তেমন বুড়ো তিনি ন'ন! তুমিও ত দেখেছ বৌ-ঠাণ! কি রকম মনে হয় তোমার?

সুশীলার মা ক্লিষ্টস্বরে বলিলেন—বয়স হয়েছে বৈ-কি ভাই!

আহা তা ত হয়েইছে, সে আর অস্বীকার যাচ্ছে কে বল কিন্তু খুব শক্ত আছেন। আর...

সুশীলার জননী ব্যগ্র আঁখি মেলিয়া চাহিলেন।

রাধাচরণ কহিলেন—অগাধ বিষয়, দেশজোড়া নাম, হীরে জহরৎ যা লোকে তপিস্তে করে পায় না, সব সুশীলার হবে।

জননী নীরব।

নগেন্দ্র রুক্ষস্বরে কহিল—অর্থই সব কাকা?

রাধাচরণ বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া কহিলেন—বাবাজী, মামার ভাতে আছ, কি দরে বালাম বিকোচ্ছে জান না ত! টাকাই সব!

নগেন্দ্র কথা কহিবার পূর্বেই জননী কহিলেন—সুশীলাকে তাঁর মনে ধরেছে?

ধরেছে, সত্যি কথা বল্‌তে কি, খুব বেশী রকমই ধরেছে। বল্লেন, সুশীলাকে পাই জীবন রাখব, না পাই, জীবন যাবে।

নগেন্দ্র ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল, তীব্র তেজে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—যাক্ জীবন! আমাদের বড় বয়েই গেল। ওঃ, কে হরের খুড়ো মাধাই দাস গো আমার!

নিজের বিবাহ-প্রসঙ্গে যোগ দেওয়া-যে কোন বয়স্থা কুমারীরই উচিৎ নয় এ শিক্ষা সুশীলার ছিল না; স্বাভাবিক লজ্জা একটু ছিল, তাহাও পুনঃপুনঃ খোঁচা খাইয়া লুপ্ত হইয়াছিল, নগেন্দ্রের কথা শেষ হইতেই, সুশীলা বলিল—আহা! স্কুলে পড়া ছেলে কি না, কথার কি শ্রী দেখ!

নগেন্দ্র এতখানি কল্পনাও করিতে পারিত না, তাহার কারণ ছিল।

কোন বাড়ীর কোন লোক না জানিলেও নগেন্দ্র নিজে জানিত সে সুশীলাকে ভালবাসে। সুশীলা তাহাদের সমাজ, ঘরের মেয়ে নয়, নগেনের পিতাও একেলে লোকের ভাবাপন্ন নন, বিবাহে এতটুকু সম্ভাবনা না না থাকিলেও নগেন্দ্র তাহার প্রণয়াভিলাষ করিত। ন্যায় বা অন্যায়, ধর্ম বা অধর্ম বিচার বিবেচনা করিবার সময় ও সুযোগ সে পায় নাই, নিজের মনে, নীরবে সুশীলাকে ভাল বাসিয়াছে, তাহার ধ্যানে বুক ভরাইয়া রাখিয়াছে, না-পাওয়ার মধ্যেও কখন-কখন তাহাকে আপন ভাবিয়া সুখী হইয়াছে। এবং তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীর একটি প্রাণী এই গোপন অভিলাষ জানিত। সে লোক সুশীলা! কেহ না জানুক, সুশীলা জানিত! তাহার আত্ম-নিবেদন কি সুশীলা লক্ষ্য করে নাই, অনুভব করে নাই? সে-যে নিঃশেষে নির্বিচারে সুশীলারই পূজা করিয়া আসিয়াছে সুশীলা যদি তাহা না জানিল তবে তাহার এতদিনের এত শ্রম, এত কষ্ট, এত জ্বালা সব বিফল হইয়া গেল যে! নগেন্দ্র কথা বলিল না, সে সবলে দাঁতে দাঁত চাপিয়া তাহার হৃদ্‌পিণ্ডটাকেই শাসন করিতেছিল।

কথা বলিয়া সুশীলা নগেন্দ্রের পানে চাহিয়াও দেখে নাই কিন্তু সাড়া-শব্দহীন কক্ষের স্তব্ধতা তাহাকে বিঁধিতেছিল, সুশীলা ইহার শেষ করিতে, শেষ দেখিতে চাহিতেছিল। মুখ তুলিতেই দেখিল, নগেন্দ্রের মুখখানা

ব্যথায় বেদনায় আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। শৈশবের সঙ্গী, বাল্যের সাথী, আজি এ যৌবনেরও সহচর নগুদা'র মুখ সুশীলা দেখিতে পারিল না, কক্ষত্যাগ করিল।

রাধাচরণ ভ্রাতৃবধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বল বৌ-ঠাণ?

সুশীলার মা অগাধ সমুদ্রে ভাসিতেছিলেন। ঐ একটি মাত্র কন্যা! বুকে ধরিয়া বৈধব্যের যন্ত্রণা হাসিমুখে সহিয়াছেন, উহাকে বুকে চাপিয়াই দারিদ্রের কঠোর নিপ্পেষণে ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই—ঐ একটি! একমাত্র! নয়নের মণি, হৃদয়ের হৃদয়, প্রাণের প্রাণ, একমাত্র ধন! অর্থ বড় না তাহার সুখ-শান্তি বড়?

আবার কন্যার এ কি দুর্বোধ্য আচরণ?

বলিলেন—কিছু বুঝলে ঠাকুরপো?

রাধাচরণও ঠিক কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই; নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িলেন। নগেন্দ্রের দিকে চাহিতে দেখিলেন, নগেন্দ্রের সে শ্যামল মুখখানি পাণ্ডুর হইয়া গেছে, চক্ষু নিষ্প্রভ, জ্যোতিহীন!

রাধাচরণ বলিলেন—কালই উত্তর দেবার কথা ছিল; তা-না-হয় দু'দিন সময়ই নেওয়া যাক্। খেলা ত আর নয়, ভেবে চিন্তে দেখ্‌তে হবে বৈ-কি!

সুশীলার জননীরও সেই ইচ্ছা।

নগেন্দ্র উঠিল; কাহারও দিকে না চাহিয়া, একটি শব্দ না কহিয়া ধীরে দ্বারটি ঠেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

উঠানে নামিয়াছে, বিদ্যুদ্বেগে সুশীলা তাহার কাছে ছুটিয়া আসিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িয়া, তাহার পায়ের উপর হাত রাখিয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিল—রাগ করেছ নগুদা? মাপ কর।

নগেন্দ্র নত হইয়া, সুশীলার হাত ছাড়াইয়া দিয়া জিজ্ঞাসিল—সুশীলা একটা কথা জিজ্ঞেস করব, ঠিক কথা বলবে?

বলবো।

গোপন করবে না ?

না।

সত্যি বল্‌বে ?

সুশীলা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—তিন সত্যি করিয়ে নিতে চাও না ? তা করাও-না,—আমি ত মিথ্যে বলব না।

নগেন্দ্র এই দৃঢ়তায় সুখী হইল না। এক মিনিট কি ভাবিল তার পর ধীরকণ্ঠে কহিল—বুড়োকে তুমি বিয়ে করবে সুশীলা ?

আমি কি পুরুষ মানুষ নগুদা' যে ইচ্ছে করলেই কিছু করতে পারি ?

নগেন্দ্রের মুখ অধিকতর বিষণ্ণ হইল।

সে জিজ্ঞাসিল—তুমি করবে কি না তাই বল ? ঘোরান কথা আমি চাইনে।

ঘোরান আবার কি !

আমার কথার উত্তর দাও সুশীলা ?

বারে ! আমার ইচ্ছেতেই না-কি সব হয় ?

নগেন্দ্র বলিল—তোমার কি ইচ্ছে—তাই কেন বল না সুশীলা ?

সুশীলা নিরুত্তর। আকাশের এক পার্শ্বে থাকিয়া চন্দ্র মৃদু আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল, তাহারই একটা ঝলক সুশীলার মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল ; নগেন্দ্র সেই মৃদু চন্দ্রকিরণহসিত মুখের পানে চাহিয়া মধু পান করিল, মত্ততায় হৃদয় ভরিয়া উঠিল। কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসিল—বল সুশীলা, তোমার ইচ্ছে নেই ?

আছে।

আছে ?

আছে।

নগু দৃপ্ততেজে সুশীলার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—এই বুড়োকে বিয়ে করবে তুমি! সুশীলা!

সুশীলা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

নগু বলিল—জান সুশীলা, তুমি 'না' বল্লে কার সাধ্য নেই যে সেই ঘাটের মড়া...

সুশীলা হাতখানিকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল—ও আমার ভাল লাগে না।

কি ভাল লাগে না সুশুমণি? বল, বল কি ভাল লাগে না?

তুমি ওঁারে গালাগাল দাও!

নগেন্দ্র তাহার হাত ছাড়িয়া দিল, বলিল—এতদূর! এরই মধ্যে এত দূর!

এ কথায় সুশীলা লজ্জা পাইয়া, মুখখানি নামাইয়া লইল।

নগু তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে আশ্বস্ত হইয়া বলিল—সুশীলা, তুমি—তুমি ঐ সেকেলে বুড়োর স্ত্রী হবে এ যে আমি ভাবতেও পারি না সুশীলা!

আমার বরাতে যা আছে, তাই হবে ত!

মিছে কথা! কিসের বরাত! তুমি একটিবার 'না' বল, এই শুধু, একটি বার 'না'; দেখি কে তোমার বিয়ে দেয় ওর সঙ্গে! সুশীলা?

কি?

নগুর কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল। সে কম্পিত দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—বলবে?

সুশীলা জিজ্ঞাসিল—কি বলব, নগুদা?

ঐ 'না'। একটিবার, শুধু একটি বার। বলবে?

তাতে কি হবে?

সবই হবে। যেখানকার লোক ও, সেইখানে চলে যাবে।

তাতে লাভ ?

নগু ক্রমশই অধীর হইয়া উঠিতেছিল ; তর্ক বিতর্ক করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। যাহারা ভালবাসার দাবী লইয়া কথা বলে, উত্তর চাহে, তর্ক তাহারা সহ্য করিতে পারে না। যুক্তি তর্কগুলা যতই অকাট্য, অখণ্ডনীয় হোক, তাহারা যে ভালবাসার উপরে অধিকার বিস্তার করিবে, প্রণয়ী ব্যক্তি তাহা ভাবিতেও কষ্ট অনুভব করে।

নগু দুই মুহূর্ত্ত নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অনুযোগের স্বরে বলিল—বল্‌বে না তাই বল !

সুশীলা পূর্বের মতই বলিল—বলে লাভ কি হবে—বল নগুদা !

নগুর প্রেম আঘাত পাইল, সে আঘাত হৃদয়ে পশিল ; হৃদয় অশ্রু ত্যাগ করিল। ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া পালায় ! যেখানে হোক্, পলাইয়া গিয়া সুশীলার চিন্তাটা ভুলিয়া যায় ! কিন্তু সে চিন্তামাত্র, সত্যের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

বলিল—লাভ এই হবে যে ও চলে যাবে, আমরা যেমন ছিলুম, তেমনি থাক্‌ব।

আমরা কি ছিলুম ?

গাঢ় অভিমান ভরা কণ্ঠে নগু বলিল—তুমি আমার, আমি তোমার —এই ছিলুম না ?

সুশীলা প্রচণ্ডবেগে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না। কখন না।

নগু বজ্রাহতের মত সুশীলার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথাগুলাই পুনরুচ্চারণ করিল মাত্র।

সুশীলা বলিল—মিথ্যে কথা !

নগুর চক্ষের সম্মুখ হইতে বিশ্বজগৎটাই লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল।

নগু যেন সাগরের কূল কিনারাহীন স্রোতের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে-ছিল, মজ্জমান ব্যক্তির মতই সে মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল—সে কথা মনে নেই সুশীলা ?

কোন্ কথা !—সুশীলার স্বর খুব দৃঢ়।

নগুর ভয় হইল, কিন্তু সে ভয় মৃত্যুভয়ের কাছে কিছুই নয়। এই ত সে অতলেই ভাসিতেছে, ইহাতেই ত তাহার মৃত্যু হইবে, তাহাপেক্ষা ভয়ের আর কি আছে ; বলিল—তুমি বলনি সুশীলা...

কি ?

আমায় ভালবাস্‌বে ?

সুশীলার পা কাঁপিয়া গেল। আজ মনে পড়ে, প্রথম যৌবন-সমাগমে একদিন এই কথাটাই সে নগুকে বলিয়া নগুর মনে আশার সঞ্চার করিয়াছিল। সেই আশা পাদপ আজ বৃহৎ তরুর আকার ধারণ করিয়াছে। সুশীলা কি উত্তর দিবে, ভাবিয়া পাইল না।

মনে নেই বোধ হয় ! মনে করিয়ে দেব ?

মনে আছে। কিন্তু...

কিন্তু কি সুশীলা ?

কিন্তু তোমায় আমায় বিয়ে ত হবে না নগুদাদা !

কে বল্লে হবে না ? আমি ত তারই জোগাড় করছি।

সুশীলা সবিস্ময়ে বলিল— কি জোগাড় করছ ?

নগুদা বলিল—শুন্‌বে সুশীলা, শুন্‌বে ? বল্‌ছি শোন !

সে একবার সতর্ক দৃষ্টিতে চারিপাশ দেখিয়া লইয়া বলিল—যত জায়গা থেকে তোমার সম্বন্ধ আসে, আমি ভাংচি দিয়ে...

তুমি !

হ্যাঁ গো—আমি !

সুশীলার তবুও বিশ্বাস হইল না; সে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল; নগেন্দ্র বলিল—হ্যাঁ গো আমি! তাতে অত আশ্চর্য্য হচ্ছ কেন সুশীলা? আমার গলার হার অন্যে চুরী করে নিয়ে যাবে; আমার প্রাণের সুশীলাকে পরে কেড়ে নিয়ে যাবে, আমি চুপ করে' বসে থাকব আর তাই দেখ্‌ব। আজ পর্য্যন্ত যত যায়গা থেকে সম্বন্ধ এসেছে, ভাংচি দিয়ে আমিই তাদের সরিয়ে দিয়েছি।

কি বলে?

তার কি কিছু ঠিক আছে সুশীলা! যখন যা মনে এসেছে, তাই বলেছি, চলে গেছে।

তুমি?

আবার কেন চমকাচ্ছ সুশীলা?

সুশীলার ইচ্ছা হইল, তখনই সে স্থান ত্যাগ করে, নগেনকে ঘৃণা করে, কাকাকে-মা'কে বলিয়া দেয়। পারিল না।

নগেন্দ্র বলিল—করিছি কার জন্যে সুশীলা? তোমার জন্যেই না? তুমি আমাকে ভালবাস্‌বে বলেই না আমার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছিলে সুশীলা? আমি ঠিক জানতুম, আর দু'এক বছর কাটিয়ে দিতে পারলেই, তোমাকে আমি পাব।

সুশীলার অজ্ঞাতসারেই সুশীলা জিজ্ঞাসিল—কি করে?

বাবা আর কদ্দিন বল...

ছিঃ নগুদা, তুমি তাঁর মৃত্যু কামনা কর!

কামনা করি না সুশীলা। তবে জানি, তিনি আর বেশী দিন নন, এই শীতেই হয় ত...

এবার সত্যই বাল্য প্রণয়ীর প্রতি সুশীলার মনটি ঘৃণায় ভরিয়া গেল। কিন্তু সে তাহা প্রকাশ করিতে পারিল না। নারী সে,

ভালবাসার পিয়াসী সে, বুভুক্ষু সে, কাতর সে—নগু যাহা কিছু করিয়াছে, তাহারই জন্য করিয়াছে, এই কথাগুলা প্রাণের মাঝে রাগিণীর মতই ধ্বনিত হইতেছিল।

নগু বলিতে লাগিল—পরাণকে কাকা বাঁশবেড়ে পাঠিয়েছেন, শুনলে ত! আমার সঙ্গে এস, কেমন বাঁশবেড়ে গেছে সে, দেখিয়ে দিই।

যায় নি।

না।

তুমি যেতে দাও নি?

হ্যাঁ: কেন দেব সুশীলা? আমার মরণ ডেকে আন্‌তে যেতে দিতে কি পারি আমি? যেচে মৃত্যু ডেকে আন্‌তে কেই-বা পারে বল সুশীলা!

সুশীলা কথা কহিল না।

নগেন্দ্র বলিল—কাকামশাই পাত্তর খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হয়ে যান, কোনদিক থেকেই যখন কোন কিছুই করতে পারবেন না, তখন আমার সুশীলামণিকে আমায় দিতেই হবে। আমাদের ভালবাসাও সফল হবে, আমার মনস্কামনাও পূর্ণ হবে!

সুশীলা নির্বাক।

নগেন্দ্র বলিল—এইবার তুমি বল সুশীলা—

কি?

বল, সেই—'না'!

সে আমি বল্‌তে পারব না!

নগেন্দ্রের মাথায় রক্ত চড়িয়া উঠিল; সে চীৎকার করিয়া বলিল—সেই বুড়োকেই তুমি বিয়ে করবে?

সুশীলা নিরুত্তর।

কথা কচ্ছ না যে!

সে ত অনেকবার বলেছি।

আমার চেয়ে সে তোমার আপন হ'ল!

তা নয়।

নয়—তবে—কি?

সুশীলা একটুক্ষণ পরে, অতি মৃদু, অতি ম্লান স্বরে বলিল—তাঁকে দেখে আমার বড় কষ্ট হয়।

কষ্ট হয়?

হ্যাঁ!

কিসের কষ্ট?

তা জানি নে। কিন্তু মনে হয় তিনি যেন বড় দুঃখী; তাঁর যেন কেউ নেই, তাঁকে দেখবার, যত্ন করবার, ভালবাসবার কেউ নেই, তাঁর মুখ দেখ্‌লে আমার বড্ড কষ্ট হয়। ক'দিনই যখন আমি জল আন্‌তে গেছি...

নগেন্দ্র রক্তবর্ণ চক্ষে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল—আলাপ হয়েছে?

সুশীলা শান্তভাবেই বলিল—না! একদিন বড্ড ইচ্ছে হয়েছিল, জিজ্ঞাসা করি কেন তিনি অত বিমর্ষ, কেন অমন করে' চেয়ে থাকেন? কিন্তু আমি যে মেয়েমানুষ! তবু—নগুদা...

ভাবাতিশয্যে সুশীলা কি যেন বলিয়া ফেলিতেছিল, চমক ভাঙ্গিয়া গেল, সুশীলা লজ্জা পাইয়া নীরব হইল।

নগেন্দ্র শেষ শুনিতে চায়, বলিল—কি বলছিলে বল না?

সুশীলা একমুহূর্ত্ত কাল কি চিন্তা করিল, তারপর বলিল—আমার কেবলই মনে হয় কেন তিনি এত দুঃখী? অত বড় লোক, অত

পয়সা, তবু কেন তিনি সদাই অমন ম্লান, অমন বিষণ্ণ! কেন তাঁর কেউ নেই...

সেইটেই তোমার বড় ভাবনা হল সুশীলা? তারই জন্যে তুমি...

হ্যাঁ নগুদা, তোমার পায়ে হাত দিয়ে বল্‌ছি এই, তারই জন্যে...

নগেন্দ্র পা ছাড়াইয়া লইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—শুনতে চাইনে আমি! মরুক্ সে—নগেন্দ্র প্রস্থান করিল।

কক্ষমধ্যে সুশীলার মা ও রাধাচরণ ভবিষ্যৎ-চিন্তায় বিভোর হইয়াছিলেন, নগেন্দ্রর তীব্র চীৎকারে তাঁহাদের তন্ময়তা ভঙ্গ হইল, দ্বার সন্নিধানে আসিয়া দেখেন, সুশীলার জ্ঞানহীন দেহটি ভূতলে লুটাইয়া পড়িয়া আছে!

সুশীলা, জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া, মাতার আকুল প্রশ্নের উত্তরে কহিল—নগুদা, বারণ করছিল মা!

কি বারণ করছিল সুশীলা?

সুশীলা সে কথার উত্তর দিতে পারিল না। লজ্জাজড়িত মুখখানি ফিরাইয়া লইল।

রাধাচরণ নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন, বলিলেন—তোর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কাজ আমরা করতে পারি না সুশীলা! তোমার যদি মনে হয় মা, যে...

রাধাচরণ একটু থামিয়া বলিলেন—তাহ'লে পরাণ বাঁশবেড়ে গেছে, আসুক, দেখি, কি বলে তারা!

সে যায় নি কাকাবাবু!

কে যায় নি রে?

পরাণ।

দূর বেটী! তখনই ভাড়াটাড়া নিয়ে বেরুল, আমি ঐ ডাক্‌বাঙলোয় যাচ্ছি যখন।

সুশীলা সে কথার কোন উত্তর দিল না।

তাহার মা বলিলেন—তোমার কাকাবাবু নিকুঞ্জবাবুকে কাল সকালে বলে দেবেন'খন যে এতে আমাদের মত নেই!

না—মা!— সুশীলা মা'র কাপড়ে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অকারণে অশ্রু বহিল। তবে একেবারে যে অকারণে—তা নয়, সন্ধান করিলে জানা যায়, গোপন আনন্দ, গোপন ব্যথাই তাহার কারণ। সুশীলার হৃদয়-মাঝে সংগোপনে আনন্দ ও দুঃখই ইন্দ্রধনু রচনা করিতেছিল; সুশীলা কাঁদিয়া ফেলিল।

জননী ও রাধাচরণ উত্তর পাইয়াছিলেন। উভয়েই বুঝিলেন মত আছে।

রাধাচরণ রাত্রের মত বিদায় লইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সমস্যা-ভঞ্জন

তিন দিন পরের কথা।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সুশীলাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া কয়েকজন লোক জিজ্ঞাসিল—রাধাচরণ বাবুর কি এই বাড়ী?

অপরিচিত স্বর শুনিয়া সুশীলা রান্নাঘরের জানালা দিয়া খুল্লতাতপুত্র পচাকে ডাকিয়া বলিল—পচা সদর দরজায় গিয়ে একবার দেখ্ না ভাই, কাকাবাবুর নাম করে কে যেন ডাকাডাকি করছে।

গদা ও তস্য ভ্রাতা পচা, প্রদীপের সামনে বসিয়া যথাক্রমে দ্বিতীয় ও প্রথমভাগ খুলিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করিতেছিল, হুড়-হুড় দুড়-দুড় শব্দে বহি শ্লেট ছড়াইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গেল।

দুই মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—দিদি-ভাই ওরা তোমাকে খুঁজছে!

আমাকে কি রে?

হ্যাঁ ভাই! তোমার নাম করলে!

দুর্ পাগল!

না হয়, তুমি দেখে এস।

গদার মা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন—বামুনের ঘরের গরু কোথাকার! ও মেয়েমানুষ, দেখ্‌তে যাবে? যা, জেনে আয় কি বল্‌ছে?

গদা চলিয়া গেল।

তখনি চার পাঁচজন লোককে সঙ্গে লইয়া সুশীলাদের উঠানে আসিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিল—ও জ্যেঠাইমা, তত্ব এসেছে গো! দেখ-সে!

সুশীলার মা মালা জপিতেছিলেন; আনন্দগদগদকণ্ঠে গদাকে ডাকিয়া বলিলেন—তোর দিদিকে ডেকে বল গদাই, ওদের নিয়ে বসাক-টসাক!

সুশীলা নিজের কাণেই মায়ের আদেশ শুনিতে পাইয়াছিল, গদাইয়ের চীৎকার করার দরকার হইল না। সুশীলা রান্নাঘরের বাহিরে আসিতেই থমকিয়া গেল। তাহাদের ক্ষুদ্র রোয়াকটি বিবিধ দ্রব্যসম্ভারে ভরিয়া গিয়াছে।

গদাই সুশীলাকে দেখিয়া বলিল—দিদি, এরা সব তোমার খোঁজ করছে!

এ সংবাদে সুশীলার সর্বদেহ কাঁপিয়া উঠিল; নিবিড় লজ্জায় তাহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল; যেখানে ছিল, এক পা আর অগ্রসর হইতে পারিল না।

তাহার মা রোয়াকের শেষপ্রান্তে দাঁড়াইয়া কন্যার লজ্জার ভাবটি দেখিয়া মনে মনে পুলকিত হইয়া, ডাকিলেন—মা সুশীলা!

সুশীলা চেতন পাইয়া 'যাই মা' বলিয়া যেমন রোয়াকে পা দিয়াছে, যে লোক ক'টি তত্ব সামগ্রীর পার্শ্বে বসিয়া গায়ের চাদর খুলিয়া বাতাস খাইতেছিল, সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া সুশীলার উদ্দেশে মাটীতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল।

এই বয়সের একটি মেয়ের পক্ষে ইহা পরম গৌরবের বিষয় হইলেও লজ্জাকর ব্যাপারও বড় কম নয়; সুশীলার হাত পা আড়ষ্ট হইয়া গেল।

সিধু পরামাণিক বৃদ্ধ লোক ; হাসিয়া কহিল—মা ঠাকরুণকে দেখে বুড়োর চোক দুটো যে জুড়িয়ে যাচ্ছে মা !

সুশীলার সন্দেহ হইতেছিল সে বুঝি জীবিতা নাই !

হ্যাঁ—রূপ বটে। সাক্ষাৎ মা জগদ্ধাত্রী !

আর একজন কে বলিয়া উঠিল—দূর মুখপোড়া ! মা মোদের অন্নপূর্ণা !

সিধুর ইহাতে আপত্তি করিবার কিছু ছিল না, করিলও না ; তবে তাহার কথার উপর কথা কহিয়া কুটুমবাড়ীতে যে তাহাকে ছোট করিল তাহাকে সে আন্তরিক ক্ষমা করিল না।

মুখখানা গোমড়া করিয়া বলিল—ক'দিন বাদেই ত যাবে মা, তখন দেখ্‌বে এই সিধেই তোমার বাড়ীর কর্ত্তা !

সিধুর প্রতিপত্তি যে সকলের চেয়ে বেশী, সিধু এই কথায় তাহা কুটুমবাড়ীর লোকগুলিকে যত না শুনাক সেই লোকটাকে বেশী করিয়া শুনাইয়া দিল ! সে লোকটা তাহা বুঝিয়া চুপ করিয়া গেল। সে রসিকতা করিতে গিয়াই জগদ্ধাত্রীকে ছোট করিয়া অন্নপূর্ণার নাম করিয়াছিল, পরামাণিককে ক্ষুণ্ণ করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। একটা বিকটাকার সিংহের গায়ে হেলাইয়া যে জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তি সচরাচর সে দেখিয়াছে তাহা যে ভিক্ষাদানরতা অন্নপূর্ণার অপেক্ষা অধিক সুন্দর এমন বিশ্বাস তাহার ছিল না। এখন তাহার ভয় হইল, জগদ্ধাত্রী চটিয়া তাঁহার বাহনটিকে লেলাইয়া না দেন ! সিধুকে পার আছে, সিংহকে পার নাই, অর্বাচীন লোকটা মুখ শুকনো করিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

সুশীলার মা দেখিলেন, মেয়ে নড়ে না, কথা বলে না, নিশ্চল প্রতিমূর্ত্তিটির মত দাঁড়াইয়া আছে ; ডাকিয়া বলিলেন—ও মা সুশীলা ! এদের জলটল খাওয়াবার একটু যোগাড় করে দাও।

সিধু সকলের হইয়া বলিল—আমরা যে এই নৌকো থেকে আসছি দিদিমা! আমাদের কি এ খাবার সময় গা?

সুশীলার মা বলিলেন—তা কি হয় বাছা! মিষ্টিমুখ না করে যে যেতে নেই!

সিধু অনুগত ভক্তের মত সুশীলার সামনে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল দাও মা দাও, তোমার হাতের মিষ্টি খেয়ে পেরাণটা জুড়িয়ে নিয়ে যাই! দাও।

মা আড়ালে ডাকিয়া সুশীলাকে বলিলেন—গদাইকে ডাক মা, কামিনীর দোকানে কি আছে, দৌড়ে নিয়ে আসুক!

কেন মা, ওতে কি খাবার নেই?

কি জানি বাছা! আর ওদের আনা খাবারই...

তা হলই বা মা! আমি আন্‌ছি।

সুশীলাকে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া সিধু অনুচর গুলিকে বলিল —দে দে, জিনিষপত্তরগুলো মা'র ঘরে তুলে দে! কোন্ ঘরে দেব— দেখিয়ে দাও ত মা!

এই বৃদ্ধের মাতৃ-সম্বোধনে সুশীলার আনন্দ কি দুঃখ হইতেছিল বলা যায় না, তবে আমূল তাহার দেহ এক অপূর্ব শিহরণে শিহরিয়া উঠিতে ছিল।

জড়িতকণ্ঠে বলিল—আমি নিচ্ছি...

তোমার এতো চাকর বাকর থাক্‌তে! বল মা, এই ঘরে দোব?

সুশীলা ঘাড় নাড়িল।

যারে সব তুলে দিয়ে আয়!

সুশীলা সেইখানেই দাঁড়াইয়া ছিল। সিধু পরামাণিক হরিদ্রা-রঞ্জিত গাত্র বস্ত্রখানির ভিতর হইতে তিনটা ভেলভেটের বাক্স বাহির

করিয়া বলিল—কাছে এস ত মা। বাবুর হুকুম, তিনখানা গয়না তোমার হাতে দিতে।

সিন্ধু বাক্সের ডালা খুলিতেই হীরামুক্তাগুলা সেই স্বল্পালোকিত স্থানে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

নাও মা।

লইবে কি! হাতদু'খানায় যে সুশীলার পক্ষাঘাত হইয়া গিয়াছিল। এ কি অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য আগুনের হল্কার মত ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে!

সিধু বলিল—হাতে দিতে যে হুকুম মা।

সুশীলা তবুও নড়িতে পারিল না।

মা সেই স্থান হইতেই বলিলেন—নাও সুশীলা।

সুশীলা কম্পিত হস্ত প্রসারিত করিল।

সিধু বাক্স তিনটি সুশীলার করতলে স্থাপিত করিয়া বলিল—আর একটি মিনতি আছে গো মা।

সুশীলা ভয়ে চক্ষু চাহিল।

একবার দিদিমা ঠাকরুণকে যে ডাক্তে হবে মা।

সুশীলার মা অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিলেন—এই যে বাবা!

সিধু আবার প্রণত হইল; বলিল—মা, বাবু বলে দিয়েছেন গয়না তিনটি মা এখনি যেন একবার পরেন!

মা সুশীলার দিকে চাহিলেন, সুশীলা লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

সুশীলার মা লোকজনগুলিকে জল খাওয়াইয়া দিলেন। ওবাড়ী হইতে ছোট জা আসিয়া পাণ সাজিয়া সকলের হাতে হাতে দিয়া

বলিলেন—বাবা গরীবের বাড়ীতে এসেছ, তোমাদের মর্য্যাদা রাখতে পারলুম না, কিছু মনে কর না বাবা !

সিধু তদগতচিত্তে কহিল—গরীবের বাড়ী বলছ কেন গা দিদিমা ? এযে আমাদের মা'র বাড়ী। তা হলে আমরা আজ চল্লুম গো দিদিমা, পেরণাম।

সিধুর সঙ্গে সঙ্গে সকলেই প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িল।

সিধু কিন্তু দাঁড়াইয়াই রহিল ; যাইবার ইচ্ছা তাহার দেখা গেল না।

যে লোকটা কিছুক্ষণ পূর্বে দুর্বুদ্ধির বশে জগদ্ধাত্রীকে ছোট করিয়া অনুশোচনায় মরিয়া যাইতেছিল, মার্জনাভিক্ষার মত স্বরে বলিল—চল পরামাণিক-দাদা।

সিধু তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিল না, বলিল—থাম্।

ঘরের দিকে চাহিয়া বলিল—মা কি একবার দেখা দেবে না গো !

সুশীলার কাকিমা ডাকিলেন—কই সুশীলা মণি, আয় মা একবার তোর ছেলেরা যে সব যাচ্ছে রে।

সিধু তাঁহারই কথার সমর্থন করিয়া বলিল—মা'র চরণ দর্শন না করে যে যেতে পারছিনে মা।

সুশীলা মেঝের উপর গয়না তিনখানিকে ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল, কাকিমার ডাকে বাহির হইয়া আসিতে যাইবে, মা বলিলেন—পরলিনে সুশীলা !

পরি মা।

সুশীলা হীরার হারটিকে গলায় পরিল, হীরার বালাটিকেও যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিল কিন্তু আর একটা জিনিষ কোথায় এবং কি ভাবে পরিতে হইবে স্থির করিতে না পারিয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িয়া গেল।

তাহার দেরী দেখিয়া কাকিমা ঘরে ঢুকিলেন।

ও কাকিমা! এটা কি গো?

কাকিমা ব্রেসলেট ছু'খানাকে টানিয়া লইয়া হাসিয়া বলিলেন—ও আমার পোড়া কপাল! এ আর জান-না? ব্রেসলেট্!

ব্রেষ্টলেট্? বুকে পরে?

দূর পাগলী! হাতে।

কাকিমা পিণ খুলিতে ব্যস্ত ছিলেন, সুশীলা বলিল—ব্রেষ্ট মানে ত বুক কাকিমা।

অত শত জানিনে বাছা। লোকে বলে ব্রেস্লেট্ তাই জানি। এই নে—তিনি পিণ খুলিয়া সুশীলার হাতে পরাইয়া দিলেন।

সুশীলা নত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় রাখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

কি করে যাই বলত কাকিমা!—সঙের মত।

সঙের মত! কি যে বলিস্ বাছা, তার ঠিক নেই। এরূপ দেখ্লে যে মরা দেহেও প্রাণ ফিরে আসে রে! জামাই কি আর আমাদের অন্ধ!

সুশীলার মনে পড়িল, কালিকার সেই কথা। কাল রাত্রে ইঁহাদের বাড়ীতে খাইতে বসিয়া তিনি যে ঠিক ঐ কথাটিই বলিয়াছিলেন—সুশীলার প্রাণটি আলোড়িত হইয়া উঠিল।

চ মা চ, তোর জন্যেই ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সুশীলা বাহিরে আসিতেই, সিধু গদগদ স্বরে বলিয়া উঠিল—গয়না পরে মা'র আমার শোভা আর কি বাড়বে; যার অঙ্গে উঠে গয়না-জন্ম ওদেরই উদ্ধার হয়ে গেল।

এই প্রশংসা যে কেবলমাত্র শ্রদ্ধারই পুষ্পাঞ্জলি, তাহা বুঝিলেও

সুশীলার মুখ চোখ রাঙাইয়া উঠিল। তাহার সেই আধভাঙ্গা বেদানার মত রক্তিম কপোল সহসা জ্বলিয়া উঠিল।

সিধু সদলবলে চলিয়া গেল।

সুশীলা ঘরে ঢুকিয়া কাকিমার কোলের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল—মিন্সে যেন ন্যাকা সঙ।

কাকিমা তাহার চিবুকটি ধরিয়া সাদরে মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন—বুড়ো মানুষ, আনন্দ হলে চেপে রাখ্‌তে পারে না। বল্লে ত শুন্‌লি, বাড়ীর বড় চাকর ঐ। অনেকদিন আছে, আপনার লোকের মতই হয়ে গেছে।

তা হোক্ না, তার জন্যে ত আমি কিছু বলছি নে। ন্যাকা-ন্যাকা কথা শুন্‌লে না,—গয়না জন্ম উদ্ধার হয়ে গেল!

কাকিমা সস্নেহে বলিলেন—সে কথাটা এমনই বা কি মিছে সুশীলা! আমার সুশীলা-মেয়ের গায়ে গয়নারই শোভা বাড়ে।

যাও—সুশীলা কাকিমাকে ঠেলিয়া দিল।

ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া বসিতেই দৃষ্টি পড়িল, স্তরে স্তরে সজ্জিত সেই দ্রব্যসম্ভার-পূর্ণ চাকচিক্যময় রৌপ্য পাত্রগুলির উপর। দুই হাতে তালি দিয়া বলিয়া উঠিল—হরি বোল্ হরি, ওগুলো ত দেওয়া হোল না!

কোন্ গুলোরে?

ঐ যে, যাতে করে সব সাজিয়ে এনেছে।

ট্রে! ও কি আর নিয়ে যাবার জন্যে এনেছিল ওরা। তোর সে বাড়ীতে অমন কত আছে।

'তোর সে বাড়ীতে' কথাটা আবার সুশীলাকে দোলাইয়া দিল।

মা বলিলেন—ছোট বৌ। ওগুলো খোল্—দেখ্ জামাই কি দিলেন?

আবরণগুলি খুলিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে কাহারই আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। এত রকমের কাপড়, জামা, সুগন্ধি, প্রসাধন-সামগ্রী একত্রে কেহ কখনও দেখিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না।

বৌ-ঠাণ।

রাধাচরণ আজ সারাদিন গ্রামে ছিলেন না, মৌরীর কুণ্ডুদের নায়েব আসিয়া বড়ালে কাছারী করিয়াছে, তিন বছরের বাকী খাজনার তলব পাঠাইয়াছিলেন, অনাদায়ে ভীষণ কাণ্ড হইবে ভয়ও দেখাইয়াছিলেন, রাধাচরণ তাই অতি প্রত্যুষেই সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিয়া একটু গুড় জল খাইয়া বড়াল যাত্রা করিয়াছিলেন, চৌদ্দ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া সেই মাত্র ফিরিয়াছেন।

সুশীলার মা শশব্যস্তে দ্বারটি খুলিয়া দিয়া বলিলেন—এস ভাই।

রাধাচরণ ঘরে ঢুকিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কাহাকেও কোন কথা বলিতে হইল না, রাধাচরণ সব বুঝিয়া লইয়া লজ্জাবনতমুখী সুশীলার পানে চাহিতেই দেখিলেন, সুশীলার রক্তোজ্জ্বল কণ্ঠের ঠিক নিম্নে সহস্র-ফণা সাপের মাথার মত কি একটা বস্তু অগ্নি ছড়াইতেছে।

রাধাচরণ ডাকিলেন—দেখি মা সুশু-মণি, এদিকে আয় ত একবার।

সুশীলার মা বলিলেন—ভুল কচ্ছিস্ কেন সুশীলা! কাকাবাবুকে প্রণাম কর।

সুশীলা জাড়ষ্ট মাথাটা নামাইল, কিন্তু তুলিতে পারিল না; কাকা মাথাটি ধরিয়া তুলিয়া দিয়া বলিলেন—হয়েছে মা হয়েছে! কি সুন্দর মানিয়েছে সুশীলা! দেখেছিস্?

সুশীলা বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিল।

আর্সিটা নিয়ে একবার দেখ না বাছা।

সুশীলা হাসিয়া কাকিমার কোলে মুখ রাখিয়া বসিল।

সুশীলার মা বলিলেন—ঠাকুরপো ! এগুলো কি সব হীরে ?

তাই ত মনে হচ্ছে গো।

জুতো খোল ; হাত পা ধোও, জামাই বাড়ীর এত সামিগ্রি, একটু জল খাও।

রাধাচরণ হাসিয়া সুশীলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—আমিই যে সম্প্রদান করব বৌ-ঠাণ, নাতি না হলে জামাই বাড়ীর খাবার কি খেতে আছে ?

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। সুশীলা আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

পচা গদা এসে জোটে নি যে ?

পচা-গদার মা বলিলেন—জোটে নি আবার ! তুমি এসে মারবে, পড়া ফেলে চলে এলে—বলতে, তবে গেল।

আর পড়া ! দিদির বিয়ে, এখন কি আর পড়াশুনো হয়।

রাধাচরণের মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে একহাতে পচার অন্যহাতে গদার হাত ধরিয়া সুশীলা ঘরে ঢুকিয়া বলিল—এত খাবার দাবার, আমার ভাই দু'টোকে বুঝি কিছু দিতে নেই গা ?

পচা গদা পড়ার বই ফেলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে দিদির অনুগামী হইয়াছিল, এক্ষণে কালান্তক-সদৃশ পিতাকে দেখিয়া তাহাদের ধড়ের প্রাণ উড়িয়া গেল। পচা ত তাড়াতাড়ি "ক ই = কই ; ব ই = বই ; ল ই = লই" মুখস্ত করিতেই লাগিয়া গেল। সুশীলা ত হাসিয়াই অস্থির।

রাধাচরণ বলিলেন—যে পর্য্যন্ত না দিদি শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যাইতেছে সে পর্য্যন্ত পচা ও গদা তাহাদের বহি শ্লেটগুলিকে বাঁশের মাচায় তুলিয়া রাখিয়া দিতে পারে। অবশ্য পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইবার অধিকার তাহাদের নাই।

পচা—'ম' 'ই' = মই করিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নেশা টুটিল!

কিন্তু হায়! থাকিয়া থাকিয়া চোখ জলে ভরিয়া আসে কেন? বুকের মাঝে কেন এ নিদারুণ শূন্যতা অনুভূত হইতেছে! এর আভাস যে অভাগিনী সুশীলা সারাজীবনে একটিবারও পায় নাই! এ তাহার কি হইল? কেন এ অশ্রু? কিসের তরে এই অসীম, অনন্ত শূন্যতা?

কেন এমন হয়?

আজিকার দিনে অশ্রু, এ-যে ফেলিতে নাই গো, ফেলিতে নাই! আজ যে দুঃখের জীবনের অবসান করিয়া সুখের জীবনে পদার্পণ, আজ কি চোখের জল ফেলিতে আছে? আজ কি মনে ভাবনা স্থান দিতে আছে?

সুশীলা সব জানে; সব বোঝে কিন্তু সেই জানা, সেই বোঝাই যে তার বিষম কাল হইল। যত মনে করে—কাঁদিতে নাই, প্রাণটা যে ততই হুহু করিয়া ওঠে, আর চোখের জলে বুক যে ভাসিয়া যায়! তাহার কত সখীর বিবাহ দিবসে সে যে নিজে উৎসবের বেশ করিয়া দিয়াছে, উৎসবের গল্প করিয়াছে, উৎসবের গান গাহিয়াছে, সেদিন যে কি ভাবে কাটাইতে হয়, কেমন করিয়া এই সুখজীবনের প্রথম দিনটিকে বরণ করিয়া লইতে হয়, তাহা সেই যে সকলকে শিখাইয়া দিয়াছে, বুঝাইয়া দিয়াছে, হাসিয়াছে, হাসাইয়াছে, মাতিয়াছে, মাতাইয়াছে,—আর তারই আজ এ কি হইল গো? কি হইল?

দরিদ্রের গৃহে যাহা কল্পনাতীত ছিল, অসাধ্য ছিল, আজ তাহাই হইয়াছে; অসাধ্য সাধিত হইয়াছে। উৎসব-বেশে সাজিয়া সেই ক্ষুদ্র গৃহখানিই আজ পরমানন্দে মাতিয়া গ্রামের লোকের চক্ষুকে ধাঁধাইয়া দিতেছে; পরম সৌভাগ্যবতীরাও আজ সুশীলার অদৃষ্টকে ঈর্ষা না করিয়া পারিতেছেন না। রাধাচরণ আজ হাতে স্বর্গ পাইয়াছেন, সুশীলার জননীর মনের কথা প্রকাশ করিবার মত ক্ষমতা আমাদের নাই; তাঁহার মনের কথা তিনি জানেন, আর জানেন বিশ্বেশ্বর—যাঁহার নিকট বিশ্বের কিছুই অজ্ঞাত থাকে না; সুশীলার জননী উৎসব কোলাহলের মধ্যেও প্রতিমুহূর্ত্তে যার রাতুল-চরণে আত্ম নিবেদন করিতেছেন। পচা গদা আজ সারা দিন ধরিয়া জামাইবাবুকে কিরূপে ঠকাইয়া কৃতিত্ব অর্জন করিবে, বার বার দিদির সঙ্গে সেই পরামর্শই করিতে আসিতেছে, দিদির কাছে উৎসাহ ও সহানুভূতি না পাইয়া তাহারা দস্তুরমত বিদ্রোহী হইয়া বলিয়া বেড়াইতেছে—দিদি আর তা বলবে কেন? জামাইবাবু যে দিদির আপনার লোক! আমরা কিন্তু ছাড়বো না, নিশ্চয়ই তাঁর মাথায় চাল-চোয়ানো কালি ঢেলে সাদা চুল কালো করে দেবো!—তাহাদের জননী হাসিমুখে ধমকাইতেছেন, কালি ঢালিলে প্রহারে প্রহারে তাহাদের অস্থি কালো হইয়া উঠিবে, তাহাও বলিতেছেন, বালকদ্বয় তাহাতেও নিরুৎসাহ হইতেছে না। তাহাদের প্রধান সহায়, জ্যেঠাই মাতা! তিনি বলিয়াছেন, শালা ভগ্নীপতি, করলই বা একটু ঠাট্টা তামাসা!

তাহারা দু'ভায়ে খুব বগল বাজাইতেছে, রাধাচরণ আসিয়া বলিলেন—ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষের মত থাক্‌বে। খবর্দার!

পচা ও গদা চটু সরিয়া পড়িল। বলা বাহুল্য দুরভিসন্ধি তাহারা পরিত্যাগ করিতে না পারিলেও অনেকখানি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল।

রাধাচরণ সারা বাড়ীটা একবার প্রদক্ষিণ করিয়া লইয়া, উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিলেন—আমার মা কৈ গা !

সুশীলা ঘরেই ছিল। এই প্রাণ-ভরা স্নেহ-ব্যাকুল আহ্বানে আর এক ঝলক অশ্রু তাহার চোখ দুটাকে, কণ্ঠটিকে ভাসাইয়া দিল। দ্রুতহস্তে চোখ দুটা মুছিয়া, আত্মদমন করিয়া সুশীলা দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। স্নেহময় পিতৃব্যের স্নেহ-তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে বাহির হইতে তাহার বড়ই ভয় হইল ! এ সজল চক্ষু যদি তাঁহার কাছে ধরা পড়িয়া যায় !

কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকিতেও সাহস হইল না। ডাকিয়া, সাড়া না পাইয়া নিশ্চিন্ত হইবার লোক কাকাবাবু নহেন, তিনি যদি হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া পড়েন, সে কি চোখের জল গোপন রাখিতে পারিবে ? তা যদি না পারে—সে যে কি হইবে ভাবিতেও সুশীলার মনখানি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

এই শুভ-দিনে, জীবন-যৌবনের সর্বাপেক্ষা মাহেন্দ্রক্ষণে, নারী সৌভাগ্যের মধ্যাহ্ন সময়ে চোখের জল, সে-যে মনে করিতেও বিভীষিকা সৃষ্টি হয় ! আজ নারী নারীর আসন অধিকার করিতে চলিয়াছে, আজ জননী তাহার গৌরবময় সিংহাসনটির পাদ-মূলে পদার্পণ করিতে যাইতেছে, আজ, আজ যে নারীর বড় আনন্দের, বড় সুখের, বড় গর্বের দিন !

সুশীলা যাহা ভয় করিয়াছিল...! কাকাবাবু আর সাড়া না দিয়াই ঘরে ঢুকিলেন !

সুশীলা ভয়ে-ভয়ে বলিয়া উঠিল—আমি যে আস্‌ছিলুম কাকাবাবু !

রাধাচরণ এক মুহূর্ত্ত তাহার নতমস্তকের পানে চাহিয়া থাকিয়া

বলিলেন—ঘরের ভেতর বসে কেন মা-লক্ষ্মী-আমার! লজ্জা হচ্ছে? কিসের লজ্জা সুশীলা? লজ্জার দিন ত আর নেই মা!

সুশীলার বুকের মধ্যে আবার তুফান গর্জিয়া উঠিতেছিল; ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়া এই স্নেহ-উৎসটির গতি নিরোধ করিয়া দিতে পারিলেই যেন সে বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু যে স্নেহ-নির্ঝরের ভয়ে সে পলাইতে চাহে, তাহার মধুরতাও ত অল্প ছিল না, সে যে প্রবল-আকর্ষণে তাহার পা দু'টিকে টানিয়া সে'খানেই অচল করিয়া রাখিয়া দিল।

রাধাচরণ বিনা-দ্বিধায় বলিয়া চলিলেন—লজ্জা করে এতদিন থাকতে হয়েছে মা; তোমাকেও; আমাদেরও। গাঁয়ে কারু বাড়ী কখনও ঢুকতুম না; ঢুকলেই ত বলবে, 'সুশীলার এত বয়েস, তত বয়েস! কি করলে! ছিঃ ছিঃ আর ছ্যা ছ্যা!' কাজ কি মা যেচে খারাপ কথাগুলো শুনে এসে! আমার ছিপ বেঁচে থাক, মা গঙ্গা বেঁচে থাকুন, বেশ ছিলুম! এখন আর আমায় পায় কে! রাজা জামাই করেছি! জানিস্ সুশীলা...

কি কাকাবাবু?

রাধাচরণ ধরা গলায় বলিলেন—তিনদিন ছিপ ছুঁই নি মা!

সুশীলা স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে কহিল—কখন ছোঁবে কাকাবাবু? ক'দিন যে হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম...

দূর বেটি কোথাকার! হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম!—কিসের পরিশ্রম! হাওয়া, হাওয়া, সুশীলামণি, হাওয়ায় করছি মা! একটু বুঝতেও পারছি না যে খাটছি!

রাধাচরণ চৌকিটায় বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—তার জন্যে নয় রে পাগলি, তার জন্যে নয়!—বলিয়া না-জানি কেন, হাসিয়াই আকুল হইলেন।

সুশীলা জিজ্ঞাসিল—কেন, বলুন-না কাকা !

রাধাচরণ হাসিয়া বলিলেন—কেন ছুঁইনি জানিস্ মা ?—কথাটা যেন মধুময় ! প্রকাশ করায় যে আনন্দ, অন্তরে আলোচনা বুঝি তাহাপেক্ষা শতগুণ আনন্দদায়ক ! রাধাচরণ থামিলেন।

সুশীলা সরিয়া আসিয়া, তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া, পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—কৈ, কাকা, বল্লেন না ত !

বলছি মা। সুশীলা, ছিপ ত দুঃখের দিনের সাথী—সে ত আছেই মা ; এ আনন্দের দিন ক'টা আর ওকে ঘাড়ে করে দুঃখের দিনগুলোকে মনে পড়াই কেন বল্ ? তাই ওদের ছুটি দিয়ে দিলাম !—স্বর ভার-ভার !

একটু থামিয়া আবার বলিলেন—নগাটাও রোজ বসতে আরম্ভ করেছে। কাল সন্ধ্যেবেলা বাঙ্‌লো থেকে আস্‌ছি, দেখি একটা সের সাতেক কালবোস্ নিয়ে বাড়ী ফিরছে। হাত সুতোয়, বুঝলি সুশীলা ?

কথাগুলা সুশীলা গ্রাস করিতেছিল, শেষ হইতেই অদম্য আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিল—নগুদা একবারও এল না কেন কাকাবাবু ?

হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া রাধাচরণ বলিলেন—কে জানে বাপু, আজকাল-কার ছোকরাদের ঐ কেমন এক ধারা ! বোঝা আমার বাপের অসাধ্যি !

কি বোঝা অসাধ্য ? এমন কি সে কথা ? সুশীলার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল ! এতই গুরুতর কি সে ! কিন্তু কি ? ওগো, সে কি ? সুশীলার যে পিতৃব্যের পায়ের উপর মাথা কুটিতে ইচ্ছা হইতেছিল। কিছু না, ঐ একটি কথা, কেন সে একটিবারের তরেও আসিয়া দেখা দিয়া গেল না ? সেই যে মৃত্যু আশীর্বাদ করিয়া গিয়াছিল, তবে কি সেই তাহার প্রাণের শেষ কথা ? না, না—নগুর কণ্ঠের সে আশীর্বাদ-অভিশাপ লইয়া জীবনে সে বাঁচিবে কি করিয়া ?

সুশীলার চোখের নীচে জল টলটল করিয়া উঠিল। সে তাহা রোধ করিতে, দাঁড়াইয়া উঠিবে, রাধাচরণ বলিলেন—বাইরে কি কোন কাজ আছে মা এখন? নেই? তবে বোস্‌না মা, দু'টো কথা বলি!

সুশীলা আড়ষ্টভাবে বসিয়া পড়িল। তাহার বড় আশা হইল, কাকাবাবু নগুদা'র কথাই কিছু বলিবেন! শুনিয়া সে তৃপ্ত হইবে, শান্ত হইবে! নিজের মনে সে ঠিক বুঝিল, নগুদা'র খুব অসুখ শুনিলেই আজ যেন সে নিশ্চিন্ত হয়, শান্ত হয়, তৃপ্ত হয়। তাহার বিবাহের দিন নগুদা' আসিবে না, এ চিন্তা অসহ্য। তার চেয়ে অসুখ ভাল। দশ দিন ভুগিবে না-হয়, তারপর ত ঠিক হইয়া যাইবে।

কিন্তু হায়! রাধাচরণ অন্য কথা পাড়িলেন।

তিনি আনন্দগদগদ স্বরে কহিলেন—আজ কলকাতার বাড়ীতে খবর গেল। সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখবার জন্যে। জামাই বল্লেন, সুশীলাকে ত যেমন-তেমন সাজান ঘরে তুলতে পারবো না। আবার তা'ও বল্‌ছেন, "সুশীলার যোগ্যি ঘর-দোরই বা পাব কোথায়। সুশীলাকে যে সোনার ঘরে তুললেও মনের আশ মেটে না।"—কিন্তু শুনলুম, রাজা রাজড়ারও না-কি তেমন বাড়ীঘর হয় না, বুঝলি মা।

সুশীলার হাত পা গুলা কাঁপিতেছিল। এতখানি! এতখানি—তাঁহার জন্য—এতখানি—এ যে একেবারে অ-সহ! সুশীলার যে কিছুই আর মনে রহিল না। আজ তাহার বিবাহ, আনন্দের দিন, অশ্রুজল ফেলিতে নাই, যদিই পড়ে, কাহাকেও দেখাইতে নাই, এ যে সব ভুলিয়া গিয়া, সে যে ডুকরিয়া কাঁদিতে যায়।

দু'হাতে শক্ত করিয়া চৌকির কানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—নগুদা কি বল্লে কাকা?—আস্‌বে না।

না মা। সে আসবে না।—তাঁহার মুখখানি সহসা দৃপ্ত হইয়া উঠিল।

সুশীলা কিন্তু ইহাতেই নিবৃত্ত হইতে পারিল না। তাহার হৃদয়ের দুকূল যে আজ সারাদিন ঐ এক চিন্তার স্রোতেই ভাসিয়া গেছে। যাহাকে পাইয়া সে ভালবাসিতে শিখিয়াছে, যাহাকে সে ভালবাসিত, বিবাহ হইবে না জানিয়াও, চিরদিন পর রহিয়া যাইবে জানিয়াও যে ভালবাসা রোধ করিতে পারে নাই, সেই নগুদা'কে এখান হইতে বিদায় লইবার পূর্বে একবার; শেষ দেখাও দেখিতে পাইবে না। সে তাহা পারিবে কি করিয়া? পারিলেও, অশ্রু ত তাহাকে পারিতে দিবে না, সে যে কেবলই কাঁদাইবে গো, কেবলই কাঁদাইবে যে!

এক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আর কি বল্লে?

আর! সে কত কথা মা! পচা গদা একটু বড় হ'লেই তোমার কাছে শহরে পাঠিয়ে দিতে বল্লেন, সেখানেই লেখাপড়া করবে। আমরা যেন পৌষ-কালী দেখ্‌তে যাই, তখন সবাইকে কলকাতায় যা কিছু দেখবার আছে, দেখাবেন। তারপর পূজোর সময় সকলকে নিয়ে কাশী যাবেন বল্লেন। ফি-বছরই কাশী, প্রয়াগ, হরিদ্বার যাওয়া আছে, আসছে বছর থেকে বুড়-বুড়ীদেরও নিয়ে যাবেন, বল্লেন।

সুশীলা এসকল কথা জানিতে চাহে নাই। সে চাহিয়াছিল শুনিতে—নগুদার কথা। যাহার অদর্শনে এই আনন্দের দিনটিও আজ নিরানন্দময় হইয়া আছে; কিন্তু এ এমনই অমৃত, পিপাসিত নারী ওষ্ঠের সম্মুখে এ এমনি স্বরগের সুধা যে নারী আকণ্ঠ, আবক্ষ পান না করিয়া পারিল না।

রাধাচরণ ভাবে গদগদ হইয়া বলিলেন—বাপ-মা'র পুণ্যে বিধাতা যে নিধি মিলিয়ে দিয়েছেন মা সুশীলা, কায়মনে আশীর্বাদ করি মা, অক্ষয় হোক্, অব্যয় হোক্। আমার মাথায় যত চুল, আকাশে যত তারা, গঙ্গায় যত ঢেউ, তত বছর তোদের পরমায়ু হোক্।—বলিতে বলিতে রাধাচরণ কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সুশীলাও কাঁদিল। কাঁদিল কিন্তু কাঁদিয়া যে এত সুখও হয়, হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া অবাক হইল। সারাদিন ত সে কাঁদিয়াছে, সে কান্নায় কেবল দুঃখই ছিল ; আর এখন ! এ-যে সুখের স্রোত। অন্তরে বাহিরে পরিপূর্ণ।

রাধাচরণ বলিলেন—"যারা তোর বাবার-আমার সত্যিকারের বন্ধু ছিল, আজ সবাই একবাক্যে বলছে, সুখী হোক্, সুখী হোক্।—কেবল মা"—রাগে, ক্ষোভে তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল।

একটু পরেই বলিলেন—আজকালকার বাবু কি-না, ইস্কুলে দুপাতা ইংরেজী পড়েছেন আর একবার মাথা কিনে বসেছেন।—এত রোষ সুশীলা নিরীহ পিতৃব্যের মুখে-চোখে কোনদিন দেখে নাই ; ভয় পাইয়া গেল।

"আমি ঐ নগাটার কথা বলছি মা। কোথায় ছোট বোনটির মত সুশীলার বিয়ে, খাটবি, খুটবি, আনন্দ করবি, তা-নয়, ছিপ ঘাড়ে করে বেরুলেন বাবু। ছিপ ধরতে শিখিয়েছিলে কে রে ? সে এই রাধু ঠাকুরই না ? সেই গুরু তোর, তিন তিনটে দিন ছিপের ছায়াটাও মাড়ালে না, আর তুই কি-না স-চ্ছ-ন্দে ছিপ নিয়ে বেরুলি। একবার বাড়ীতে পা দিলি নে ; তাও আবার মুখ ঘুরিয়ে বল্লি কি না, ওকি বিয়ে, ও জবাই !—এত বড় মুখ তোর হল ! কি বলব, আজকের দিন্ ! !" তিনি আত্মসম্বরণ করিলেন। তবে সে'টা বড় অল্প চেষ্টায় হয় নাই। আত্মসম্বরণ করিতে তাঁহাকে ঘর ছাড়িয়া যাইতে হইল।

সিক্ত মৃত্তিকা খর রৌদ্র-স্পর্শে তখনি যেমন তাতিয়া উঠে, সুশীলার সিক্ত মনও তেমনি শক্ত হইয়া উঠিল। কি নীচ, স্বার্থপর সেই লোকটা ! এই তাহার ভালবাসা ! নিত্য পদে-পদে অশুভ কামনা করিয়া ভালবাসার প্রতিদান দেওয়া ! কি অশুচি মন ! বরাবর শত্রুতা সাধিয়াও

তাহার সাধ পূর্ণ হয় নাই ! বিবাহিত জীবনটাকেও বিনষ্ট করিবার এত চেষ্টা এত উদ্যম, এত উৎসাহ !

ইহারই জন্য সে কাঁদিয়াছে ! কি পাপ ! কি পাপ ! তাহাকে না দেখিয়া সে এত কাতর হইয়াছিল—মহাপাপ বটে। এখন যে তাহার মুখের চেহারাটা ভাবিতেও ঘৃণা হইতেছে। সেই অশুচি মনটা ভাবিতেও যে লজ্জা হয়, রাগ হয় !

পাপ জানিতে পারিয়া, অনুতপ্ত মন যেমন প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে, সুশীলাও তাহার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে কঠিন হইয়া কাজের বাড়ীতে বাহির হইয়া পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রথম প্রণয়

অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহ।

একখানি প্রথম শ্রেণীর রেল-কামরায় একটি পুরুষ ও একটি রমণী উপবিষ্ট। রাত্রি হইয়াছে, বিদ্যুৎ-আলোকে কামরা উদ্ভাসিত। মাথার উপরে দুই খানা পাখা এই দু'জনকে শান্তি দিতেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া, এদিকে ওদিকে করিয়া ফিরিতেছিল।

পুরুষ নিকুঞ্জ, তরুণী সুশীলা।

নিকুঞ্জ গদী মোড়া দেওয়ালে মাথা হেলাইয়া একখানি ইংরেজী সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন, তরুণী সুশীলা বাহিরের কৃষ্ণ আকাশে তারার খেলা, ছুটন্ত দৃশ্যগুলির দিকে চোখ রাখিয়া নীরবে বসিয়া আছে। কতক্ষণ তাহারা এমনিভাবে বসিয়া আছে কেহ জানে না, তাহারা নিজেরাই জানে না। সুশীলার যখনই মনে হইতেছে তাহারা অ-নে-ক ক্ষণ এমনি করিয়া বসিয়া আছে, তখনই একটা অজানা, অননুভূতপূর্ব বিরক্তিতে তাহার মনটি ভরিয়া উঠিতেছে; সে জানালা হইতে মুখ সরাইয়া ওধারে উপবিষ্ট পুরুষের পানে চাহিতেছে। নিকুঞ্জের মুখখানি সম্পূর্ণ সে দেখিতে পাইতেছে না, তাঁহার মাথার কিয়দংশমাত্র তাহার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, সে সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া শ্রান্ত হইয়া আবার মুখ ফিরাইয়া লইতেছিল।

বসিয়া বসিয়া সুশীলার বড়ই শ্রান্তি বোধ হইতেছিল। এলোমেলো বাতাস আসিয়া তাহার চুলগুলিকে উড়াইয়া দিতেছিল; সুশীলার গা সিড় সিড় করিতেছিল, কিন্তু পাশেই যে সোনালি জরির কাজকরা দামী

শালখানা পড়িয়াছিল—সেখানাকে টানিয়া লইতেও তাহার কুঁড়েমি ধরিল, বিরক্তি আসিল!

তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, কেন উনি শালখানি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিতেছেন না! সারাদিন—যখন তাহারা বোটে ছিল উনি ত তাহারই সঙ্গে কথা কহিয়াছেন; কত দিনের, কত গল্প বলিয়াছেন। কোন্ খানটায় একটা প্রকাণ্ড কুমীরকে উপর্য্যুপরি তিনটি গুলিতে বিদ্ধ করিয়া মারিয়াছিলেন, কোন্খানে বোট লাগাইয়া তাঁহারা দুর্গাঠাকুরের বিসর্জন দেখিয়াছিলেন, সে কত কথা! সুশীলা যে প্রাণ হারাইয়া, চেতনা হারাইয়া সেই সব শুনিয়াছিল। তারপর নৌকায় বড় বেশী সময় লাগে বলিয়া একটা ঘাটে নৌকা লাগাইয়া, সুশীলার হাত ধরিয়া হাঁটিয়া ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী ধরিয়াছিলেন, শীঘ্র কলিকাতায় পৌছান যাইবে বলিয়া; কিন্তু কৈ, শীঘ্র ত পৌছান গেল না, সেই সন্ধ্যাবেলা গাড়ীতে চড়া হইয়াছে, গাড়ী ত অবিরাম ছুটিয়াছে, কলিকাতা ত আসিল না।

সে আকুল আগ্রহে দেবতা-বাঞ্ছিত যে অমরাপুরীর দর্শনাশায় উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে, সে কলিকাতা কতদূরে? কোথায়? কতক্ষণে তাহার দেখা মিলিবে?—সুশীলা শালখানা টানিয়া গায়ে জড়াইল। চিররহস্যময় অদৃষ্টপূর্ব অজানা সহরের অচেনা চির-ঈপ্সিত বাড়ীখানি তাহার দুইটি কালো চোখে ভাসিয়া উঠিল। সুশীলা একবার স্বামীর পানে চাহিয়া, চক্ষু সরাইয়া লইল। এই অসীম শূন্যতা ছাড়াইয়া, বাহিরের ঘন অন্ধকার ভেদ করিয়া সে কোথায় চলিয়াছে? কাহার জন্য, কোন্ কণ্ঠের অমৃতময় কথাগীতের জন্য, কোন্ মুখের আদর, আপ্যায়ন, কাহার ভালবাসার বাণী তাহার লক্ষ্য!

গাড়ী একটা শুকনো নদীর পুলের উপর উঠিল। নদীর বুকে ক্ষীণ

জলের রেখায় গাড়ীর আলো পড়িয়া চিক্ চিক্ করিয়া উঠিল। সুশীলা একদৃষ্টে তাহারই পানে চাহিয়া রহিল। গাড়ীখানা ছুটিয়া ছুটিয়া বুঝি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, শ্রান্তির নিঃশ্বাসধ্বনি ছাড়িতে ছাড়িতে গাড়ী থামিয়া পড়িল।

নিকুঞ্জ মাথা তুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিলেন; ছোট একটি ষ্টেশন; কেরোসিনের আলোর গায়ে ষ্টেশনের নাম লেখা রহিয়াছে, পড়িবার চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। সুশীলা বাহিরে মুখ রাখিয়া বসিয়াছিল। ষ্টেশনে কয়েকজন যাত্রীকে দৌড়াদৌড়ী করিয়া বেড়াইতে দেখিয়া তাহার মনটি সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। বহুক্ষণের নির্জনতার কষ্ট যেন অনেকখানি লাঘব হইয়া আসিল। আলো-অন্ধকারে ঘেরা এই ছোট্ট ষ্টেশনটি তাহার বড় ভাল লাগিল। মনুষ্য-লোক হইতে বহুদূরে আসিবার যে চিন্তাটি এতক্ষণ পাষাণ স্তূপের মত তাহার বুকে চাপিয়া বসিয়াছিল, ষ্টেশনে লোক চলাচল দেখিয়া তাহা যেন কমিয়া গেল। তবে ত সে লোকালয়েই আছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুশীলা ভিতরের দিকে চাহিবে, তাহার দৃষ্টি মিলিত হইল, নিকুঞ্জের উজ্জ্বল দুইটি চোখের সহিত।

নিকুঞ্জ স্নেহের স্বরে বলিলেন—কি দেখ্‌ছিলে সুশীলা?

সুশীলা নতমুখে কহিল—কৈ, কিছুই ত না!

নিকুঞ্জ বলিলেন—দেখ্‌ছিলে বৈ কি সুশীলা! ষ্টেশন বুঝি! অনেক-ক্ষণ পরে গাড়ী থাম্‌লে ষ্টেশন দেখ্‌তে ভারি ইচ্ছা হয়, না!

সুশীলা এ কথার কোন উত্তর দিল না। সে বলিতে চাহিল, ষ্টেশন নয়, এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু তাহার চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে তাহাই সে দেখিয়াছে। ইচ্ছা না-থাকা সত্ত্বেও দেখিয়াছে। তবে কি দেখিয়াছে সে জানে না, তাই বলিতে চাহিলেও কথাটা বলিতে পারিল না।

নিকুঞ্জ সুশীলার পার্শ্বে পতিত একখানি সচিত্র পত্রিকা তুলিয়া লইয়া বলিলেন—আমি মনে করেছিলুম তুমি ও পড়ছিলে। পড়লে না কেন সুশীলা ?

পড়তে আমার ভাল লাগে না।

ছবি ত অনেক ছিল এতে।

ভাল লাগে না।

নিকুঞ্জের উজ্জ্বল মুখ সহসা মেঘাবৃত হইল।

ম্লানমুখে ম্লান হাসি হাসিয়া নিকুঞ্জ বলিলেন—সুশীলা, ছবি দেখতে ভাল লাগে না ? দেখ-দেখি, কেমন ছবি সব ?—নিকুঞ্জ পত্রিকা খুলিয়া বহুবর্ণরঞ্জিত একখানি সুন্দর চিত্র সুশীলার চোখের সামনে ধরিলেন।

সুশীলা আহত চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া বলিল—আমার ভাল লাগে না।

মেঘ পুঞ্জীভূত হইল। কপালে উদ্বেগ-চিহ্ন সমূহ প্রকটিত হইল।

কি তোমার ভাল লাগে সুশীলা ?

সুশীলা নীরব।

বল না সুশীলা, কি তোমার ভালো লাগে ?

নিকুঞ্জ বাম হস্তখানি সুশীলার পিঠের উপর রাখিয়া, তাহাকে নিকটে টানিতে টানিতে বলিলেন—লক্ষ্মীটি আমার, বল ? কি ভালো লাগে ?

সুশীলার রুদ্ধ অভিমান গলিয়া অশ্রুর রূপ ধরিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িতে চাহিতেছিল কিন্তু আজ মিলনের মধুময়ী প্রথম রাত্রে চক্ষের জল ফেলিবে না ঠিক করিয়া সুশীলা আত্ম-দমন করিতেছিল, কথা কহিতে পারিল না।

নিকুঞ্জ ধীরে বলিলেন—সুশীলা, বোটে উঠবার সময় মা কি বলে দিয়েছিলেন, মনে আছে ?

মা'র নামোচ্চারণ মাত্রে সুশীলা জাগিয়া উঠিল ; কিন্তু সে জাগরণেও অশ্রু জড়াইয়া ছিল, সুশীলা মুখ খুলিতে পারিল না।

ভুলে গেছ সুশীলা ?

না।

বল ত, কি বলেছিলেন ?

সুশীলার কণ্ঠ আর্দ্র হইয়া আসিল ; অতি কষ্টে বলিল—মার কাছে যেমন মন খুলে কথা বলতুম, তোমার কাছেও ত তেমনি—সুশীলা মুখ ঢাকা দিয়া থামিল।

নিকুঞ্জ তাহার মাথাটিকে বুকের উপর চাপিয়া, চুলগুলিকে সযত্নে গোছাইতে গোছাইতে বলিলেন—মা'র জন্যে মন কেমন করছে সুশীলা ?

সুশীলা অতি ধীরে কহিল—না।

না ?—নিকুঞ্জ বিস্ময় দমন করিতে পারিলেন না।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিয়াছিল। ট্রেণের গর্জন ভেদ করিয়া সুশীলার চাপা কান্নার শব্দ নিকুঞ্জের হৃদয় আলোড়িত করিয়া দিল। কয়েক মুহূর্ত্ত মূঢ়ের মত বসিয়া থাকিয়া নিকুঞ্জ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—সুশীলা, তোমার কি দুঃখ হচ্ছে আমায় তুমি বলবে না— সুশীলা ?

এই স্নেহের সম্ভাষণের অভাবই সুশীলাকে কাঁদাইয়াছিল, পাইতেও সুশীলা কাঁদিল। গাঢ় স্বরে বলিল---তোমায় বলব না ত কা'কে বলব ?

নিকুঞ্জ তাহার মাথাটিকে আরও জোরে, আরও স্নেহে, আরও মমতায় বুকের উপর চাপিলেন। কিন্তু প্রেয়সী নারীকে বক্ষে ধারণ করিতেও পুরুষের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল না, বরং নিকুঞ্জের মুখে চোখে, ললাটে একটা বিষাদের গাঢ় ছায়া বিস্তার করিল ; নিকুঞ্জ এক মুহূর্ত্ত পরে সুশীলার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া ধীরে একটি চুম্বন করিলেন।

প্রথম চুম্বন !

তারপর উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—রাত বারোটা বেজেছে, আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আমরা কলকাতা পৌঁছুব সুশীলা !

সুশীলা আর কলিকাতার জন্য ব্যস্ত ছিল না, সাড়া দিল না।

নিকুঞ্জ কোন কথা না বলিয়া, খবরের কাগজখানি পাট করিয়া রাখিলেন; কিছু পরে বলিলেন—সুশীলা, আর কখনো তুমি কলকাতায় এসেছিলে?

না।

কলকাতার কথা কখনও শুনেছ?

শুনিছি।

কি শুনেছ বল ত সুশীলা আমার?

এ ছেলে-মানুষী প্রশ্ন সুশীলার ভাল লাগে নাই, সে কথা কহিল না।

সেখানে মানুষে বাঘ খায়, সাপের জিবে বিষ নেই, এই সব শুনেছ বোধ হয়?

না।

তবে?

আমি জানি-নে!—সুশীলা সরিয়া বসিল।

নিকুঞ্জ স্নেহ-স্বরে বলিলেন—জান বৈ কি! কি শুনেছ বলই না সুশীলা?

সুশীলা সরোষে কহিল—কি আবার শুনব? যা আছে, তাই শুনেছি।

সেইটে কি তাই আমি জান্‌তে চাইছি যে সুশীলামণি!

সুশীলার পক্ষে এ সকল অত্যন্ত অসহ্য হইয়া পড়িয়াছিল, সুশীলা কি বলিয়া যে এই সব ছেলেমানুষী-কাণ্ডের অবসান ঘটাইতে পারে, ভাবিয়া পাইতেছিল না।

নিকুঞ্জ সুশীলার একখানি হাত টানিয়া নিজের দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া বলিলেন—কলকাতা বাঙ্গালা দেশের সব চেয়ে বড়, সুন্দর, সাজান সহর বুঝলে সুশীলা!

সুশীলার অন্তর ক্ষোভে রোষে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল, তাহার মন বলিতেছিল—হোক্ গে।

নিকুঞ্জ বলিলেন—সেখানে চিড়িয়াখানা আছে। তাতে পৃথিবীর সব রকম জন্তু ধরে রাখা হয়েছে।

সুশীলার কান্না পাইতেছিল, ইচ্ছা হইতেছিল, বলে—হোক্, তাহার কি!

নিকুঞ্জ নিবিষ্টচিত্ত শ্রোত্রীটির মনোরঞ্জন করিতেই বলিয়া উঠিলেন—তুমি ত তাজমহল দেখ-নি সুশীলা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নিশ্চয়ই তোমার খুব ভাল লাগ্‌বে। যারা তাজমহল দেখেছে তাদের চোখে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ধরে না বটে কিন্তু তাজমহল যারা দেখে নি, তাদের কাছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল খুব সুন্দর লাগে, ছবিটির মত! জ্যোৎস্না রাত্রে দেখ্‌লে ভুলতে পারা যায় না!

সুশীলা বলিতে চাহিতেছিল, সে দেখিবেও না, মনেও রাখিতে চাহিবে না! হোক্ সে সুন্দর, হোক-না-কেন চমৎকার!

নিকুঞ্জ বলিলেন—আমাদের বাড়ী থেকে অনেকদূর বটে তবে মোটরে গেলে দশ মিনিটও লাগে না।

সুশীলা সে স্থান ছাড়িয়া যাইতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যাইত। সে কি কচি-খুকী যে তাহাকে এমন করিয়া ভুলাইতে হইবে! এমন করিয়া কেন তিনি তাহার অন্তরের শ্রদ্ধা হারাইতেছেন! সে ত তাঁহাকে পূজা করিতে আসিয়াছে, ভালবাসিতে আসিয়াছে, সেবা করিতে আসিয়াছে, তাহাকে এ-সব তুচ্ছ খেলাঘরের স্তোকবাক্য শুনাইয়া কেন তাহার মনটিকে এমন করিয়া কষ্ট দিতেছেন? নিজের কথা বলুন, সুশীলা প্রাণ দিয়া শুনিবে। আদরের কথা বলুন, বুভুক্ষু হৃদয় ভরিয়া সেই সুধা সে পান করিবে। এসব কেন! এ সব কেন!

সে যে তাঁহার মুখের কথা শুনিতে মরিতে পারে ! কি সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা ; কি আয়ত নয়নদ্বয় ; কি রক্তোজ্বল সুগঠিত নাসা ; সর্বাপেক্ষা সুন্দর তাঁহার শুভ্র সুন্দর কেশদাম ! আর সুন্দর—অধিকতম সুন্দর, সুন্দরতম সুন্দর, তাঁহার মুখের সেই চুম্বন। মনে করিতে এখনও যে চোখ জড়াইয়া আসিতেছে, স্বপ্নের মত মধুময় মনে হইতেছে। কি পবিত্র সেই একটি চুম্বন। কি মিষ্ট কিন্তু কি অল্পস্থায়ী ! কেন তিনি আবার তাহাকে চুম্বন করিলেন না ! সে ত আর কিছুই চাহিত না, সে যে তাহা হইলে সব ভুলিয়া অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িত—একটি চুম্বন, বড় ছোট, বড় ছোট ! চুম্বন করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় না ; কেন—হয় না ?

সুশীলা স্থিরভাবে বসিয়া রহিল।

নিকুঞ্জ বুক পকেট হইতে ঘড়িটি বাহির করিয়া দেখিয়া বলিলেন- আর আধঘণ্টা তিন-কোয়াটার পরেই আমরা হাওড়া পৌছোব সুশীলা। সারারাত বসে আছ, কত কষ্ট হয়েছে তোমার, না সুশীলা।

না।

না-কি ?

আপনার কাছে রইছি, কিসের কষ্ট !

সুশীলা দেখিল না, এই প্রাণ মন মাতানো কথায়ও নিকুঞ্জের মুখখানি কি বিমর্ষই না হইয়া গেল।

নিকুঞ্জ বলিলেন—তারে খবর দেওয়া আছে, মোটর হাজির থাকবে, তখনি বাড়ী গিয়ে ঘুমোতে পারবে তুমি !

আমি ঘুমুতে চাই নে।

সারারাত জেগে থাকবে ?

সুশীলা কথা কহিল না, যেন কি অন্যায় কথা বলিয়াছে এই ভাবে মুখটি নামাইয়া লইল।

নিকুঞ্জ তাহার চিবুক ধরিয়া মুখখানি তুলিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—কিন্তু রাত জেগে, বসে বসে তোমার যে কষ্ট হচ্ছে তা আমি তোমার শুকনো মুখ, বিরস চোখ দেখেই বুঝতে পারছি সুশীলা। ছেলে মানুষ, তুমি...

সুশীলার বড় কান্না পাইল। কেন তিনি তাহাকে ছেলে মানুষ ভাবিয়া ছেলেমানুষী কথায় তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহার যে ইচ্ছা হইল, চীৎকার করিয়া বলে, ছেলে মানুষ সে নয়, নয়, নয়।

সুশীলা পারিল না, ধরাগলায় বলিয়া ফেলিল—আপনি আমাকে—কিন্তু নারীত্বের নিবিড় লজ্জা তাহার বক্তব্য শেষ করিতে দিল না, কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল।

নিকুঞ্জ বলিলেন—সুশীলা, আপনি বলা কবে ছাড়বে তুমি, বলতে পারো সুশীলা ?

সুশীলার মনে হইল, তাইত, কেন সে আপনি বলিয়া তাঁহাকে দূর করিয়া রাখিয়া দিতেছে ? এ ত তাহারই অন্যায়। তিনি হয়ত সেই-জন্যই তাহার সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে পারিতেছেন না, মন দিয়া মিশিতেছেন না। এতক্ষণ ধরিয়া যে গ্লানি নিকুঞ্জের ব্যবহারের জন্য তাহার মনটিকে বিষাক্ত করিতেছিল তাহাই এখন নিজের দিকে ধাবিত হইল।

নিকুঞ্জ বলিলেন—আপনি না বল্লে কি...

—আর বলব না।

—বল 'তুমি' ?

সুশীলা ধীরে ধীরে মুখ খুলিল ; বলিল—তুমি।

নিকুঞ্জ পুনরায় সস্নেহে সুশীলার মাথাটিকে কাছে টানিবেন, ঘট্ করিয়া গাড়ী থামিয়া গেল ; সুশীলার মাথাটি সজোরে নিকুঞ্জের বুকের উপর পড়িয়া ঠুকিয়া গেল।

নিকুঞ্জ তাড়াতাড়ি বাহিরে মুখ বাহির করিয়া অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালিত করিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন—ষ্টেশন ত নয়!

তাইত! ষ্টেশনে ত আলো থাকে, মানুষ থাকে।

বোধ হয় সিগন্যাল পায় নি। সুশীলা, সিগন্যাল কাকে বলে জান?

না।

কিন্তু জানিবার আগ্রহও সুশীলার হইল না; গাড়ী ছুটুক আর নাই ছুটুক তাহার কি? সে অন্ধকারে চক্ষু রাখিয়া বলিল—গাড়ী যদি আর না চলে?

নিকুঞ্জ হাসিয়া বলিলেন—না চলে কি সুশীলা?

যদিই না চলে?

তা হয় না সুশীলা, চলবেই।

কই, চল্‌ছে না কেন তবে?

দাঁড়াও, সিগন্যাল দিক্।

যদি না দেয়?

কি না দেয়? সিগন্যাল? তা কি হয় সুশীলা!—নিকুঞ্জ হাসিলেন।

যদি না দেয়?

দেবেই গো, দেবেই। সুশীলামণিকে কি তারা মাঠের মাঝখানে ফেলে রাখতে পারে? বাড়ী পৌঁছে দেবেই। কিছু ভয় নেই, লক্ষ্মী, এখনি বাড়ী পৌঁছে যাব।

তার জন্যে বুঝি আমি বলছি? আমার ত বাড়ীও যা, গাড়ীও তাই। তুমি রয়েছ।

নিকুঞ্জ আর কিছুই বলিলেন না। তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিলেন; কামরার দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সুশীলা জানালায় মুখ রাখিয়া বসিয়াছিল, বলিল—এত লোক কোথা থেকে এল ?

গাড়ীর লোক, নেমে দেখ্‌ছে, গাড়ী থাম্‌ল কেন।

কেন থাম্‌ল ?

কিছু ত বুঝতে পারছি নে সুশীলা! দাঁড়াও ঐ বুঝি গার্ড আস্‌ছে, ওকে জিজ্ঞাসা করছি।

আলো হাতে ঝাণ্ডি বগলে, সাদা টুপি পরা গার্ড সাহেব সেই দিকেই আসিতেছিলেন, নিকুঞ্জ ইংরেজীতে জিজ্ঞাসিলেন—কি হইয়াছে মহাশয় বলিতে পারেন ?

গার্ড সাহেব প্রথম শ্রেণীর কামরায় ইংরেজবেশ পরিহিত যাত্রী দেখিয়া, গাড়ীর কাছে সরিয়া আসিয়া বলিলেন—এঞ্জিনের কি গোল ঘটেছে, দেখ্‌তে যাচ্ছি! এসে বলব!

গার্ড চলিয়া গেলেন।

সুশীলা বলিল—কি বল্লে ? গাড়ী যাবে না ত ?

দেখ্‌তে গেল, এসে বল্‌বে।

সুশীলা জুতার বোতাম ক'টি টিপিয়া দিয়া নিকুঞ্জের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সিগারেটের আলো-মুখে যাত্রীরা কলরব করিতেছিল, কোন্‌ এক কামরা হইতে শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল, সুশীলা বলিল—সিগন্যাল দিলে না ?

সিগন্যালের জন্যে দাঁড়ায় নি সুশীলা। এঞ্জিনে কি দোষ হয়েছে।

তাহ'লে গাড়ী আর যাবে না ত ?

নিকুঞ্জ দেখিলেন, সুশীলার মুখ-খানি চাপা হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পিঠের উপর হাতখানি রাখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন—তাহ'লে কি হবে সুশীলা ?

কি আবার হবে! বেশ হবে!

কি বেশ হবে?

বেশ ত! এইখানে থাক্‌ব। দেখ, দেখ, ঐ তারাটা কি-রকম জ্বল্ জ্বল্ করে উঠ্‌লো। আচ্ছা ওটা ত একটু আগে ওখানে ছিল না?

এখন উঠ্‌ল।

সব তারা যেন মিইয়ে গেছে—না?

তা হবে!

সুশীলা বড় ক্ষুণ্ণ হইল। 'তা হবে!' এই কি উত্তর!

নিকুঞ্জ বলিলেন—গাড়ী না চল্লে কি বেশ হবে তা ত বল্লে না সুশীলা?

বারে! এই ত বল্লুম, এইখানে থাক্‌ব।

কি খাবে?

যা পাব!

কোথায় শোবে?

কেন এ গাড়ী ত থাক্‌বে!

নিকুঞ্জ হাসিয়া জিজ্ঞাসিলেন—কোথায় বেড়াবে?

কেন—ঐ ত মাঠ দেখা যাচ্ছে, ধূ ধূ করছে—ঐ খেনে!

নিকুঞ্জ হাসিলেন। বলিলেন—রাঁধবে কে? ঠাকুর ত সঙ্গে নেই!

হা অদেষ্ট! আমরা বুঝি ঠাকুরের রান্না খাই! আমি নিজে রাঁধব।

তুমি রাঁধতে পার সুশীলা?

সুশীলা রাগে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—না, কেবল খেতে পারি! আচ্ছা, রাতটা পোয়াক, কালই রেঁধে তোমায় খাওয়াব। সত্যি করে বল্‌তে হবে কিন্তু, কে ভাল রাঁধে, তোমার ঠাকুর না আমি?

তোমায় রাঁধতে দিলে ত রাঁধবে?

কে দেবে না ?

তোমার বাড়ীর লোক ?

আমার বাড়ীর লোক ! কে সে ? মা ?

না গো না। তোমার নতুন বাড়ীর লোক !

তারা ত চাকর বাকর ! আর ত কেউ নেই সেখানে ! হ্যাগো, কে আছে আর সেখানে বল-না ?

সে ত তুমি জান সুশীলা, চাকর-বাকরই।

তবে ? কে দেবে না ?

আমি !

তুমি দেবে না ? ঈস্ ! একদিন খেলে রোজ রাঁধতে বল্‌বে তখন !

না সুশীলা ! গোলাপ সুন্দর ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ রোদ তাকে পুড়িয়ে না দিয়ে যায় ! রান্না ঘরে তোমায় আমি ঢুকতে দোব না।

সুশীলা বড় মুস্কিলে পড়িয়া গেল। মেয়েমানুষ সে, রান্নাঘরে ঢুকিবে না ? মা গো ! সে কি কেউ পারে !

নিকুঞ্জ দ্বারের পার্শ্বেই গদীমোড়া চেয়ারটায় বসিয়া সুশীলাকে সামনে দাঁড় করাইয়া তাহার হাত দু'টি ধরিয়া বলিলেন—গোলাপের মত এই সৌন্দর্য্য, অপ্সরীর মত এত রূপ—রান্নাঘরে ঢুকে ধোঁয়ায়, আগুনের ঝাঁজে নষ্ট হতে দিতে পারে—এমন পাষণ্ড কি আছে সুশীলা ?

রান্নাঘরটা বুঝি পাষণ্ডের জায়গা ?

হ্যাঁ সুশীলা !

সুশীলা ভ্রূ ভঙ্গি করিয়া বলিল—কি কথাই বল্লে, আহা ! আমি তা হলে মস্ত পাষণ্ড ?

কেন ?

এতদিন ত আমি দু'বেলাই রাঁধতুম্ !

তখন আর এখন ?

কেন ? এখন কি এমন ধিঙ্গী হইছি যে…

না সুশীলা।—নিকুঞ্জ অনুনয়ভরা কণ্ঠে কথা কয়টি বলিয়া ক্ষীণ নয়নে সুশীলার বিস্ময়াকুল মুখের পানে চাহিলেন।

সুশীলা বিস্ময়াভিভূতের মত চাহিয়া জিজ্ঞাসিল—তা হলে কি করব ?

তাহাকে আরও কাছে, আরও অন্তরে টানিয়া নিকুঞ্জ বলিলেন ছবির মত, স্বপ্নের মত, ঐ আকাশের ঐ তারাটির মত আমার সামনে তুমি জল্‌বে সুশীলা! কেশে বেশে তোমার সৌন্দর্য্য উথলে উঠ্‌বে, মুখে চোখে তোমার পুলক ভ'রে উঠ্‌বে, শাড়ীতে, চরণে-তোমার মৃদু গুঞ্জন উঠবে—আমি তাই দেখ্‌ব!

সুশীলা এক বর্ণও বুঝিতে পারিল না, বলিল—সে কি!

বুঝতে পারলে না মণি! এমনি কাপড় জামা পরে, এমনি জুতো মোজা পরে—ঠিক এমনই ভাবে তুমি আমার সামনে ঘুরে বেড়াবে, আমি তাই দেখব!

দিন রাত জুতো মোজা পরে ? মা গো! সে আমি পারব না, কিছুতে পার্‌ব না।

নিকুঞ্জ দীন নয়নে, আর্ত্ত স্বরে কহিলেন—কিন্তু আমার যে ঐ সাধ সুশীলা!

সুশীলা মগ্ন হইয়া গিয়াছিল, কিসে, কে জানে!

পারবে না সুশীলা ?

সুশীলা ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসিল—দিনরাত কাপড়-জামা এঁটে—সে যে বিশ্রী!

বিশ্রী নয় সুশীলা! ঐ আসিটার সামনে গিয়ে একবার যদি তুমি দাঁড়াও, তুমিই বল্‌বে বিশ্রী নয়।

আর কিছু করতে পার না ?

নিকুঞ্জ কি উত্তর দিতেন জানি না, উত্তর দিবার অবকাশ মিলিল না।

—হ্যালো !

গার্ড সাহেবের গলা।

নিকুঞ্জ দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

ইয়েস্ ?

এঞ্জিন ডিসেব্লড।

ডিসেব্লড্ ? চল্‌বে না ?

না। নেক্‌সট ষ্টেশন এখান থেকে সাত মাইল, লোক গেছে, সেডে তার কর্‌তে !

তার মানে—কতক্ষণ ?

হতে পারে—সারা রাত্রি। আপনি শুতে পারেন। শুভ-রাত্রি !

শুভ-রাত্রি।

সুশীলা বলিল—আজ রাত্রে গাড়ী চল্‌বে না ?

না—সুশীলা, এঞ্জিন বিগড়েছে।

ভালই ত।

সুশীলা শাল খানাকে বেশ করিয়া গায়ে জড়াইয়া শুইয়া পড়িল।

নিকুঞ্জ দাঁড়াইয়া রহিলেন দেখিয়া সুশীলা মাথাটা অল্প একটু তুলিয়া বলিল—শোবে না ?

না, না—থামা গাড়ীতে কি শুতে আছে ? চোর ছ্যাঁচড়ের ভয় নেই ?

চোর ছ্যাঁচড়ের নামে সুশীলা ভয় পাইল ; শালখানা খুলিয়া ফেলিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—ও বাবা !

না, না অত ভয় নেই সুশীলা! তুমি ঘুমুতে পার, আমি জেগে আছি। তুমি শোও।

আমার ঘুম হবে না—বসে থাকি।

কোন এক দূর কামরা হইতে অপরিচিত মধুর কণ্ঠের সঙ্গীত-ধ্বনি নৈশ-নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া দিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল—

"প্রেমসে প্রেম মিলে না তো—
মিলে শুধুই রোদন;
প্রেমসে কুছ শান্তি হ্যায় নেহি—
আছেই কেবল রোদন।"

বড় দুঃখের স্বর, বড় করুণ গানের ঐ কথাগুলি। সুশীলার হৃদয়-তারে করুণ সুরের দুঃখ-ব্যথা যেন ঝরিয়া পড়িতেছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রণয়-সলিলে ভেলা ভাসিল

অপরিচিত, অ-দৃষ্ট-গায়ক একটির পর একটি কত গান গাহিল। কোনটির কথা মনে নাই, ভাষা মনে নাই, কিন্তু সব গানের সেই এক সুরে যে করুণতা ব্যক্ত হইতেছিল তাহা সুশীলার মনে মনে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। সুশীলার মন কতবার স্বীকার করিয়াছে যে সে লোকটি নিশ্চয়ই খুব দুঃখী। খুব দুঃখী না হইলে একই রকমের দুঃখের গান সে গাহিবে কেন? অন্য গান কি সে জানে না? যখন গান শিখিয়াছিল, তখন কি সবই দুঃখের গান শিখিয়াছিল? অমন মিষ্ট কণ্ঠ যার, নিশ্চয়ই সে যত ভাল গান, সব শিখিয়াছে, সব জানিয়াছে; গাহে না, হয়ত ভাল লাগে না; নয়ত দুঃখের চাপে পড়িয়া ভুলিয়া গিয়াছে; তা যদি না হয় কেহ তাহাকে খুব দুঃখ দিয়াছে, তাই কেবল দুঃখের ব্যথাই তাহার মনে ভরিয়া আছে, গান ভরিয়া গিয়াছে, প্রাণ ভরা সেই দুঃখের ব্যথায়।

সুশীলা সারারাত্রি তাহার কথা ভাবিয়াছে। এত দুঃখের গান যে গাহে, সে লোকটাকে দেখিবার আগ্রহে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। একবার অদম্য আগ্রহ দমন করিতে না পারিয়া সে শয্যা ছাড়িয়া নিকুঞ্জের কাছে ছুটিয়া গিয়াছিল কিন্তু নিকুঞ্জ তখন ট্রেনের ভাগ্য-চিন্তায় এত তন্ময় ছিলেন, তাহার আগমন-শব্দও জানিতে পারেন নাই। নারী ফিরিয়া আসিয়া শয্যার উপর আছড়াইয়া পড়িল; নিকুঞ্জের তন্ময়তা সে শব্দও তাঁহার নিকট গোপন রাখিয়াছিল।

এই দুই যাত্রী পরস্পরের এত নিকটে, তবু কত দূরে, কেহ যেন কাহাকে দেখিতেও পাইতেছে না।

একে একে তারা নিবিয়া গেল ; আকাশের শেষ সীমায় যে একটু জ্যোৎস্নার আলো ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহাও ম্লান হইয়া গেল ; বাতাস থামিয়া গেল ; আকাশ যেন অন্ধকারের স্তব্ধতায় ভরিয়া গেল।

সুশীলা সেই স্তব্ধ আকাশের পানে নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিল। গান থামিয়া গিয়াছে, তাহার স্বর সুশীলার মন ছাড়া আর কোথায় বাজিতেছে না, এতক্ষণ থাকিয়া থাকিয়া যে জন-কোলাহল উঠিতেছিল, ঐ স্তব্ধ আকাশটার মত তাহাও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। সুশীলা যেন এতখানি স্তব্ধতা সহ্য করিতে পারিতেছিল না। সমস্ত দেহ ভরিয়া একটা যেন কিসের বেদনা থাকিয়া থাকিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিয়া খোঁচাইয়া তুলিতেছিল।

কোন খবর ?—নিকুঞ্জ কাহাকে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসিলেন।

হ্যাঁ, বোধ হয় অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই এঞ্জিন আসিয়া পড়িবে।

ধন্যবাদ।

নিকুঞ্জ ফিরিয়া চাহিলেন, সুশীলা হাত দুটি কোলের উপর চাপিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, বলিলেন—সুশীলা, আর একটু পরেই গাড়ী চল্‌বে।'

সুশীলা পূর্বাকাশে নবোদিত একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, সাড়া দিল না।

আকাশবীণার তারে তারে কি এক রাগিণী বাজিয়া উঠিল ; পূবাকাশের দ্বার ঠেলিয়া কে এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ যেন বিশ্বের অন্ধকার তাড়াইতেই রক্তিম নয়নে প্রকাশ হইতেছিলেন। সূর্য্য কি ? সোনার মত দেহ, আকাশ যেন স্বর্ণ-স্পর্শে কষ্টিপাথরের মত রাঙাইয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ হর্ষধ্বনিতে রক্তাকাশ ভরিয়া উঠিল।

নিকুঞ্জ দ্বার খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিলেন নতুন এঞ্জিন এসেছে সুশীলা।

নবাগত এঞ্জিন তাহার আগমন বার্ত্তা খুব জোরে বাঁশী বাজাইয়া জানাইয়া দিল। যাত্রী যাহারা সারারাত পাথর কাঁকরের উপর বেড়াইয়া রেল কোম্পানীকে অভিশাপ দিয়াছে, হরিধ্বনি করিয়া যে যার নির্দ্দিষ্ট কামরায় উঠিয়া পড়িল।

সুশীলা হরিধ্বনিতে উঠিয়া বসিয়াছিল। ট্রেণ চলিবে এই শুভ-কামনায় যাত্রী দলের মধ্য হইতে যে আনন্দের সোর-গোল পড়িয়াছিল তাহারই মাঝে সুশীলা শুনিতে পাইল সেই অপরিচিত দুঃখীটি তাহার নিজস্ব সুরে দুঃখের গানই গাহিয়া চলিয়াছে—

"স্বাধীনতা কোথায় হিয়ার—
বিলায়ে দেছে তোমার করে
স্বাধীন স্বাধীন করছি যতই—
মন চলেছে তোমায় ভরে।—

সুশীলা নিকুঞ্জের হাত ধরিয়া কাতরকণ্ঠে কহিল—কে গাইছে ?

সুশীলার ব্যথাতুর মুখ দেখিয়া নিকুঞ্জ ভীত হইয়া বলিলেন—কোন যাত্রী হবে। কেন সুশীলা ?

"এ 'কেন'র কি উত্তর আছে ? যদিই থাকে, সুশীলা ত জানে না।

নিকুঞ্জ বলিলেন—আমি বুঝতে পারছি সুশীলা, রাত্ জেগে তোমার বড় কষ্ট—

কিছু না।......এই যে ট্রেণ নড়েছে।

ট্রেণ চলিল।

হাওড়া ষ্টেশনে বৃহৎ মোটর দাঁড়াইয়াছিল, অতি অল্প সময়ে না, না, তাহাদের বাড়ী পৌঁছাইয়া দিল।

বাড়ীর হাতায় প্রবেশ করিয়া, ফুল বাগানের দিকে চাহিতে সুশীলার চক্ষু জুড়াইয়া গেল। কত রকমের কত ফুল, কত পাতাবাহার গাছ, কত পুষ্পিত লতা যে বাগানের সৌন্দর্য্য বাড়াইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সুশীলার দৃষ্টি সেই সৌন্দর্য্য ভরিয়া গেল।

নিকুঞ্জ বলিলেন—নামো সুশীলা।

দ্বারবান মোটরের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল।

সুশীলা নামিতেই শুভ্রবাসা এক রমণী অভিবাদন করিয়া বলিল-আসুন মা।

সুশীলা স্বামীর পানে চাহিল।

যাও সুশীলা।

সুশীলা নিঃশব্দে পদসঞ্চারে রমণীর অনুসরণ করিল।

মার্বেল পাথরের চারিটি সিঁড়ি উঠিয়া, রমণী মুক্তার ঝালর গুলি সরাইয়া বলিল—চলুন।

প্রকাণ্ড হল্। আসবাব ঝক্ ঝক্ করিতেছে; সুবৃহৎ তৈলচিত্রগুলি সব যেন জীবন্ত হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে চাহিতেছে; সুশীলার পা আর চলে না। এক ঘরে এত ছবি, এত সুন্দর এত আসবাব।

হল অতিক্রম করিয়া আবার সোপান-শ্রেণী। রমণী বলিল—উপরে চলুন।

সুশীলা একবার মুহূর্ত্তের জন্য পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিল, স্বামী আসিতেছেন কি-না।

রমণী তাহা বুঝিয়াই বলিল—কাপড়-চোপড় ছেড়ে নীচে আসবেন, চা খাওয়া হয়।

ঙ্গুলি-নির্দ্দেশে একটি রুদ্ধদ্বার দেখাইয়া দিল। দ্বারের সম্মুখে ময় পিতলের টবে কতগুলি পাতা-বাহার গাছ।

সুশীলা ঘরে ঢুকিয়া একখানা সোফায় বসিয়া পড়িল। বিস্ময় তাহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছিল। এই ঘরের শোভা যেন সকল ঘরকেই পরাস্ত করিয়াছে।

রমণী বলিল—এই ঘরটি আমরা আপনার জন্যে রেখেছি মা।

সুশীলা চাহিয়া দেখিল।

পছন্দ হয়েছে মা?

সুশীলা কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না।

রমণী রৌপ্য পালঙ্কের নিকটে গিয়া বলিল—এর গায়েই সুইচ আছে পাখারও, আলোর-ও! এই টেবিলে বসে আপনি লেখাপড়ার কাজ করতে পারবেন; এই দু'টো আলমারী-ভর্ত্তি বাঙ্গালা বই আছে; এই টেবিল, এর মধ্যে চুল বাঁধবার সমস্ত সরঞ্জাম আছে।—সে পশ্চিম দিকের দেওয়ালের পর্দাটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া বলিল—এই চান-কামরা!

সুশীলা কথা কহিল না।

রমণী বলিল—জুতোটা খুলে দিই, পা-টা দিন।

না, না—আমি খুলছি।

দিলুমই বা আমি! রমণী হাসিয়া মাটিতে বসিয়া সুশীলার চরণ দুখানি কোলের উপর তুলিয়া লইল। সুশীলা অনেক আপত্তি করিল কিন্তু রমণী জুতা খুলিয়া, আর্শির নীচের তাক্ হইতে একজোড়া লাল মখমলের চটি টানিয়া পায়ে পরাইয়া দিয়া বলিল—একটু সোজা হয়ে বসুন, জামাটা খুলে দিই।

জামা থাক্ না!

না, না—সে কি হয়? গাড়ীর জামা! একটু সোজা হোন্!

রমণী বোতাম কয়টি খুলিয়াছে মাত্র, সুশীলা বলিয়া উঠিল—না, না, থাক্—আমি নিজেই খুলছি।

রমণী হাসিয়া সরিয়া গেল। স্নান-কক্ষের পর্দা ঠেলিয়া ঢুকিয়া, তখনি বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—জল দেওয়া হয়েছে, মুখ হাত ধুয়ে আসুন। স্নান বোধ হয় বেলাতেই করবেন?

সুশীলার সমূহ বিপদ! কখন যে কি করিতে হয়, তাহা সে জানে না; নিয়ম কাহাকে বলে, বাঁধাবাঁধি কাহাকে বলে, সে জানিত না। চুপ করিয়া রহিল।

রমণী হাসিয়া বলিল—এখন যদি স্নান করতে ইচ্ছা হয়, তা'ও করতে পারেন; তবে কলকাতার কলের জল, প্রথম দিন একটু বেলাতেই স্নান করা ভাল।

—তাই করব। কিন্তু—তোমাকে আমি কি বলে ডাক্‌ব?

—যা বলে ইচ্ছা। দাসীকে যা বলে ডাকে লোকে।

—কি বলে? আমি ত জানি-নে!

—আমার নাম কদম—কাদম্বিনী থেকে লোকে কদম করে নিয়েছে।

—আমিও কদম বলে ডাক্‌ব ত?

—আপনার ইচ্ছা।

এ ত আরও মুস্কিল। স্বামীর উপর তাহার রাগ হইল। কেন তিনি সঙ্গে আসিয়া এ সকল কথা বলিয়া দিয়া গেলেন না।

কদম হাসিয়া বলিল—কদম বলেই ডাক্‌বেন। কিন্তু আর দেরী করবেন না, এখনই চা দেওয়া হবে।

—চা! আমি ত চা খাইনে!

—চা না খান্, খাবার ত খাবেন!

—এত সকালে—

—আর সকাল কৈ! আট-টা যে বাজে! যান, হাত মুখ ধুয়ে আসুন, আমি ততক্ষণ কাপড় চোপড় ঠিক করি।

—একটা সেমিজ আর একটা সাদা কাপড় ঠিক করে রাখবেন শুধু।

—রাখবেন নয়, মা, রেখো, আমি ঝি !

সুশীলা লজ্জায় মুখটি নীচু করিয়া লইল।

কদম বলিল—কিন্তু সাদা কাপড় সিল্কের ত নেই।

—সিল্কের নয়, সাদা।

—সে ত নেই ! যা কিছু কাপড় ম্যানেজার বাবু কিনে রেখেছেন, সব সিল্কের, বেনারসি, পার্সী, মান্দ্রাজী আর সব রঙিন। সাদা কেনেন নি, বাবুর নাকি বারণ ছিল।

—বারণ ছিল ?

—তাই ত শুনেছি মা !

—কেন ?

—আমরা ঝি-চাকর ; কেন, তা কেমন করে বল্‌বো মা ?

—কিন্তু দিনরাত কি ও সব পরা যায় ? সাদা কাপড় না হলে চলে !

—বলব মা, ম্যানেজার বাবুকে ! এখন কি দোব বলুন ? একখানা নীল পার্শি—তারই সেমিজ, জ্যাকেট দিই ?

সুশীলা কথা কহিল না, স্নান-ঘরে প্রবেশ করিল।

কদম বস্ত্রাদি ঠিক করিয়া লইয়া স্নানকক্ষের পর্দা ঠেলিয়া বলিল—হয়েছে মা ?

—হয়েছে। আমার কাপড় ?

—আমি নিয়ে যাচ্ছি।

পাঁচ মিনিট পরে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, চা প্রস্তুত ; বাবু বসিয়া আছেন।

সুশীলা মখমলের চটিটা না পরিয়াই বাহির হইতে যাইতেছিল. কদম বাধা দিয়া বলিল—মা—জুতোটা !

—জুতো আমি পরব না।

—কেন মা, অমন রাঙা পা দু'খানি নোংরা করবেন!

সুশীলা মাগীর উপর হাড়ে চটিয়া গিয়া বলিল—শুধু পায়ে থাক্‌লে পা নোংরা হয় বুঝি?

কদম ঘাড় নাড়িল।

—তা হলে এতকাল ত আমি জুতো পরিনি, পা ত রয়েছে।

কদম আর কিছুই বলিল না।

সিঁড়ির গায়ে গায়ে বড় বড় সোণার হল-করা মুকুর সুশীলার স্বর্ণ-মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব ধরিয়া হাসিয়া উঠিল; আকাশের গায়ে যেন বিদ্যুতের লহরী লীলা লীলায়িত হইয়া উঠিল। এত সুন্দর সে! তাহার নিজের রূপ-বিভা তাহাকে পরম সুখী করিল। সুশীলার মনে হইল, তাহার এই রূপ, এই অতুল সৌন্দর্য্য, বিকশিত যৌবন সব সফল হইতে উপক্রম করিতেছে। যে দেবতার পূজার তরে এই আয়োজন সেই দেবতার দর্শন তাহার মিলিয়াছে, অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া দিতে পারিলেই সে ধন্য হইয়া যায়।

নিকুঞ্জ সোপান নিম্নেই দাঁড়াইয়াছিলেন। সুচিক্কণ কুঞ্চিত বস্ত্র পরিহিত, আদ্দির পাঞ্জাবিতে দেহাবৃত নিকুঞ্জকে দেখিয়া সুশীলার সত্যই দেবতা জ্ঞান হইল। এই যে এত আসবাব, এত লোকজন, এত ধনৈশ্বর্য্য, ইহা যেন কেবল ঐ লোককেই মানায়!

নিকুঞ্জ মৃদু হাস্যে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

কিন্তু সুশীলার ইচ্ছা হইতেছিল, মাটিতে জানু পাতিয়া ঐ পা দু'টির ধূলা তুলিয়া মাথায় রাখে, বুকে ধরে!

কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায় সুশীলা।

লজ্জায় সুশীলার—পদদ্বয় শক্তি হারাইয়া ফেলিল।

এস সুশীলা—খাবে এস!

নিকুঞ্জ সুশীলার হাত ধরিলেন; কয়েক পা চলিতেই যে ঘরের সম্মুখে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন, পরিচ্ছন্ন বেশে ভৃত্য তাহার দ্বার খুলিয়া দাড়াইয়াছিল। তন্মধ্যে উভয়ে প্রবিষ্ট হইলেন।

ছোট্ট একখানি শ্বেত পাথরের টেবিলে দু'জনের মত আহার্য্য সজ্জিত ছিল। নিকুঞ্জ একখানি চেয়ারে বসিয়া, অন্য চেয়ারখানি দেখাইয়া বলিলেন—বস সুশীলা!

সুশীলা বসিল না।

নিকুঞ্জ আবার বলিলেন—বস সুশীলা! কত ক্ষিদে পেয়েছে তোমার, তার ঠিক নেই।

সুশীলা বলিল—তুমি খাও আগে।

তা হবে না সুশীলা; একসঙ্গেই দু'জনে খাব।

একসঙ্গে?

হাঁ।

একসঙ্গে যে খেতে নেই।

সে কি সুশীলা। কে বলেছে তোমায়—খেতে নেই?

সুশীলা নতমুখে বলিল—তুমি খাও না, আমি তার পর খাব।

সে হবে না, সুশীলা; একসঙ্গে না হলে খাব না।

যদিও সুশীলাকে কেহ বলিয়া দেয় নাই, তবে হিন্দুর ঘরের মেয়ে, হিন্দুর গৃহে পালিতা মেয়ে, কিছুতেই স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে আহার করিতে রাজী হইল না। বলিল—আপনি খান,—

আবার আপনি?

সুশীলা হাসিয়া চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া, বলিল—আমি বসছি, তুমি খাও।

নিকুঞ্জ ক্লিষ্টস্বরে বলিলেন—আমার কথা শুনবে না সুশীলা?

কি কথা?

খাবে না ত?

খাব না—আমি কি বলিছি? পাতে খাব।

পাতে—সে কি! কি সব্বোনাশ! আমার যে উৎকট রোগ আছে।

সুশীলার পূর্ণচন্দ্রের মত মুখখানির উপর শরতের মেঘ আসিয়া দাঁড়াইল; তখনই আবার সরিয়া গেল, সুশীলা বলিল—তা হোক, আমি পাতেই খাব।

রোগ আছে—জেনেও?

হ্যাঁ।

কিন্তু আমি কখনই তোমাকে পাতে খেতে দিতে পারব না সুশীলা, আমার সঙ্গেই তোমাকে খেতে হবে। নাও—বলিয়া নিকুঞ্জ সুশীলার দক্ষিণ হস্তখানি তুলিয়া রেকাবের উপর রাখিয়া দিলেন।

সুশীলা বলিল—একসঙ্গে যে খেতে নেই।

আছে—খাও।—দৃঢ় কণ্ঠে কথা কয়টি বলিয়া নিকুঞ্জ গোটা দুই আঙুর তুলিয়া সুশীলার মুখে গুঁজিয়া দিলেন।

ভৃত্য চায়ের ট্রে সাজাইয়া আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। অন্য দিনের মত চা ঢালিবার উদ্যোগ করিতে, নিকুঞ্জ তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিলেন।

অদৃশ্য হইলে সুশীলাকে বলিলেন—সুশীলা চা ঢেলে দিতে পারবে?

সুশীলা সজ্জিত ট্রের পানে চক্ষু রাখিয়া বলিল—পারব; তুমি দেখিয়ে দেবে ত!

কিছু দেখাতে হবে না। সব ঠিক আছে, ঢেলে নিলেই হবে।

সুশীলা একবার মাত্র ট্রে-র উপরিস্থিত বাটী চামচগুলি দেখিয়া লইয়া বলিল—চা ত নেই।

চা ওর মধ্যে দেওয়া আছে। ও কি, উঠছ কেন? বসে—বসেই হবে সুশীলা?

এঁটো হাত, ধুয়ে আসি।

ধুতে হবে না, ঢাল।

কখ্খনো আমি এঁটো হাতে চা ঢেলে দোব না।

সুশীলা হাত দু'টা গুটাইয়া বসিয়া রহিল।

আমি বল্লেও দেবে—না?—স্বর অত্যন্ত কৌতুকপূর্ণ।

সুশীলার চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল; বলিল—কেন এমন কথা তুমি ...! এতে পাপ হয় যে।

নিকুঞ্জ হাসিয়া বলিলেন—ছেলে মানুষ সুশীলা। তুমি এত পাপ-পুণ্যি শিখলে কোত্থেকে! ছিঃ মণি, ঢাল।

অগত্যা সুশীলা চা ঢালিয়া দিতে বাধ্য হইল।

নিকুঞ্জ চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিয়া, চুমুক দিতে দিতে বলিলেন—তুমি খাবে না সুশীলা।

—আমি ত চা খাইনে।

—তখন খেতে না, এখন থেকে খাও। দু' চারদিন খাও, তারপর আর ইচ্ছা না হয়—খেয়ো না।

—কেন?

—দু' চারদিন বাদে যদি ভাল না লাগে, ইচ্ছা না হয়, ছেড়ে দিও।

—এখন থেকেই ছাড়ি না।

—না। একসঙ্গে চা খেতে বস্‌লে অনেক গল্প করা যায়।

সুশীলা দ্বিরুক্তি না করিয়া চা ঢালিয়া লইল। এমন কিছু বিস্বাদ নয়, খাইতে ভালই লাগিল।

—কাল এতক্ষণ কোথায় ছিলুম সুশীলা?

—সুগন্ধায়!

—তোমাদের দেশটির বেশ নাম, না সুশীলা?

—সত্যি বেশ নাম। সুগন্ধা।

—কিন্তু আজ আর তার সে নাম নেই সুশীলা!

সুশীলা চিত্রার্পিতের মত স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া, বলিল—কেন? যে ছিল বলে দেশ সুগন্ধা নাম পেয়েছিল, আজ যে সে কলকাতায়! সে কি?

আমার সুশীলামণির সৌরভেই ত সে সুগন্ধা; সুশীলা ত সেখানে আর নেই; তবে আর কিসের সুগন্ধা সে! আজ তার অন্য নাম হয়ে গিয়েছে।

সুশীলা লজ্জায় নিকুঞ্জের কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া বলিল—যাও! কাঁধে কাঁধ ঠেকাইয়া উভয়ে বসিয়া রহিল। একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষায় সুশীলার বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহা পূর্ণ হইবার পূর্বেই নিকুঞ্জ আসন ছাড়িয়া উঠিলেন।

—দুপুর বেলা কি করবে সুশীলা? ঘুমুবে?

—দুপুর বেলা আমার ঘুম আসে না।

—বেড়াতে যাবে একটু?

—কোথায়?

—এখানে সেখানে!

—যাব কিন্তু—

—কিন্তু কি বলছিলে, বল?

—কিন্তু কারু বাড়ী যাব না।

—কেন সুশীলা?—নিকুঞ্জ একটা অজানা আশঙ্কায় শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

—না, সে আমি যাব না। তোমার সঙ্গে কথা কইতে পাব না, তোমার কাছে থাক্‌তে পাব না, সে আমি যাব না।

নিকুঞ্জ বলিলেন—তার দরকারও নেই সুশীলা! কার বাড়ী আমরা যাব না; ধর, একটু ঘোড়-দৌড়ের মাঠে দৌড় দেখে আসা যাবে। যাবে?

—যাব।

—বেশ, খাওয়া দাওয়ার পর, কেমন?

সুশীলা ঘাড় নাড়িল।

নিকুঞ্জ বলিলেন—তোমার ঘরের আলমারীতে বই ভরা আছে, একটু পড় গে। আমি একবার কাছারীতে যাই, কাজ কর্ম দেখে আসি। কেমন?

সুশীলা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—আচ্ছা।

—এসে একসঙ্গে খাব, মনে আছে?

সুশীলা দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলিল—ঐ ত তোমার...

—দোষ, না সুশীলা?

—তাই কি আমি বলিছি?

—বল্লেও ত দোষ হবে না সুশীলামণি আমার!

নিকুঞ্জ তাহার গণ্ডে দুইটি টোকা মারিয়া প্রস্থান করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

এই রজনী—প্রথম না শেষ?

রাত্রি ৯টা।

আহার শেষ হইয়া আসিয়াছে, নিকুঞ্জ ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—আমার জন্যে ফল আন্তে হবে না, একজনের মত আন।

ভৃত্য প্রস্থান করিলে, সুশীলা জিজ্ঞাসিল—তুমি ফল খাবে না কেন?

—বড় সর্দি হয়েছে। তুমি খাও।

—তবে বারণ কর, আমিও খাব না।

—কেন, তোমারও কি সর্দি হল, মণি?

সুশীলা নিকুঞ্জের হাসিতে লজ্জা পাইয়া বলিল—তা কেন! খাব না।

—আমি না খেলে তোমারও বুঝি খেতে নেই?

—নেই-ই ত!

—পাপ হয় বুঝি?

সুশীলা মিথ্যা রাগিয়া, হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ, হয়!

ভৃত্য ফলের রেকাবী সুশীলার সামনে রাখিয়া দিল, সুশীলা আর না বলিতে পারিল না। দুই টুকরা ফল মুখে দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

নিকুঞ্জ নীরব, চিন্তামগ্ন।

কতক্ষণ এই দুই প্রাণী সেখানে সেইভাবে বসিয়াছিল, তাহারা জানে না। তবে সুশীলার মনে হইতেছিল, সময় যেন আর কাটিতেছে না। স্বামীর মুখের পানে চাহিতে বেন তাহার সাহস হইতেছে না; কথা কওয়া দূরে থাক, নিঃশ্বাসের শব্দেও সে চমকিয়া উঠিতেছে।

হঠাৎ নিকুঞ্জ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—তোমার ঘুম পেয়েছে সুশীলা!

এটা যেন প্রশ্ন নয়, এই ভাবেই কথিত হইল। সুশীলাও সাড়া দিবার চেষ্টা করিল না; করিলেও তাহার সে সুযোগ মিলিত কি না সন্দেহ।

নিকুঞ্জ তখনি কহিলেন—তোমার ঘরে যাবে সুশীলা!

সুশীলা সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়াইয়া উঠিল; চক্ষু নত, বদনমণ্ডল বিষাদ-মগ্ন। সুশীলা মুখ তুলিয়া চাহিতে গেল, পারিল না; কথা কহিতে গেল, পারিল না; তাহার মাথার উপর জিহ্বার উপর কে যেন পাষাণ চাপাইয়া দিয়াছিল। ভয়ে, হতাশ্বাসে, মনোভঙ্গে সুশীলা যেন কি হইয়া গিয়াছিল। কেন জানে না, তাহার মনের ভাব সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না।

—যাই!—অতি মৃদুকণ্ঠে সুশীলা কথা কয়টি বলিল।

নিকুঞ্জ তাহাকে বাম হস্তের বন্ধনে বাঁধিয়া অতি নিকটে টানিয়া তাহার মুখের উপর একটি চুম্বন করিয়া, ছাড়িয়া দিলেন। সুশীলার হাত, পা, মাথা কাঁপিয়া গেল।

আস্তে আস্তে পা বাড়াইয়া সে দ্বারের দিকে যাইতেছিল, নিকুঞ্জ আগে আসিয়া দ্বারটি খুলিয়া দাঁড়াইলেন। দ্বার উত্তীর্ণ হইয়াই সুশীলা দাঁড়াইয়া পড়িল।

একটা কথা! সুশীলা একটা কথা জানিতে চায়! সে ত ঘরে যাইতেছে, তিনি কখন্ আসিবেন?—আর কিছু না, এই একটি কথা, একটি প্রশ্ন তাহার করিবার ছিল। কিন্তু এ প্রশ্ন করা ত সহজ ছিল না, নির্লজ্জ, বেহায়ার মত এ প্রশ্ন কি করা যায়? কিন্তু না করিলেও যে নয়! এ কথাটা না জানিয়া, না শুনিয়া ঘরে গিয়া সে থাকিতে পারিবে কেন?

বাহিরে আজ কিসের কাজ? এতই কি দরকারী সে কাজ যে আজিকার রাত্রে, তুইটি মিলিত জীবনের প্রথম মিলন রজনীতে তাঁহাকে বাহিরে দেরী করিতেই হইবে? এ ত উচিৎ নয়! আজ কাজের ভার কি লইতে আছে? আজ যে...

সুশীলা দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া কথা ক'টা ভাবিয়া লইয়াই পর্দাটা ঠেলিবার জন্য হাত বাড়াইল, পারিল না; আস্তে আস্তে হাতটি সরাইয়া লইল; দ্বিতলে উঠিবার জন্য ধীরে অগ্রসর হইল। কিন্তু প্রাণের স্ফূর্তির সঙ্গে চরণের শক্তিও সে দূরে ফেলিয়া আসিয়াছিল, পা আর চলে না।

মন কেবলই সেই প্রশ্ন করে—কতক্ষণে আসিবেন?

কেন বলিয়া দিলেন না, কত দেরী তাঁহার হইবে?

সে যদি ঘুমাইয়া পড়ে?

ছি ছিঃ তাহা হইলে সে যে বড়ই বিশ্রী দেখাইবে! আজিকার এ মধু রজনী ঘুমাইয়া, অচেতন হইয়া নষ্ট করিতে হইবে!

না, সে তাহা পারিবে না। কিন্তু তিনি যে কিছুই বলিয়া দিলেন না। যদি ঘুম আসে, যদি না তাহাকে বিদায় করিতে পারে!—তার চেয়ে বলিয়া দিলেই ত সব চেয়ে ভাল হইত; সে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া বই পড়িত।

সুশীলার জিহ্বায় ভাষা ছিল না, সুশীলা সে কথা জিজ্ঞাসিতে পারিল না। প্রাণ-ভরা ব্যাকুলতা লইয়া মূঢ়ের মত আবার সে সিঁড়ির মাঝেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মনে হইল, এই কয়টা সিঁড়ি বই ত নয়, নামিয়া দেখিয়া যায়, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া যায়!

ইচ্ছা করিলে সেইখানে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিয়া উত্তর নেওয়া যায়! কিন্তু পারিল না। কথা কয়টি তু'টি অধরে তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিল, বাহির হইল না।

তাহার মনে হইল এই প্রশ্ন করা তাহার অন্যায় হইবে। তিনি হয়ত ক্ষুণ্ণ হইবেন! ছি, অধৈর্য্য হইয়া তাঁহাকে ক্ষুণ্ণ করিবে সে! না, সে তাহা পারিবে না; তাঁহাকে ক্ষুণ্ণ করিতে, বিরক্ত, করিতে কি পারে সে!

না গো না, সে তাহা পারে না। প্রাণ থাকিতে পারে না, প্রাণ গেলেও পারিবে না, ইহাই সে জানে!

তিনি যে দেবতা! নারীজন্মের দেবতা, নারী-জীবনের দেবতা; নারীর মরণেরও যে দেবতা তিনি! সুশীলা সেই দেবতাকে ক্ষুণ্ণ করিবে!

সুশীলা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল; নিজ কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিতেই আর্সিতে তাহার ভয়-মলিন শুষ্ক পাণ্ডুর মুখ-ছবি প্রতিবিম্বিত হইল; সুশীলা ভয় পাইল যতখানি, কষ্ট হইল তাহার অনেক বেশী, এই শুষ্ক মলিনতার মূল কারণটি মনে করিয়া!

কদম ঘরের মেঝের গালিচার উপর পড়িয়া ঘুমাইতেছিল, কর্ত্রীর পায়ের শব্দে তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল; ত্রস্তে দাঁড়াইয়া উঠিল।

—কাপড় আনি মা?

সুশীলার নীরবতাকেই তাহার সম্মতি অনুমান করিয়া, কদম পর্দা সরাইয়া চলিয়া গেল।

তখনো সেই উজ্জ্বল মুকুরে প্রোজ্জ্বল প্রতিবিম্বটি ভাসিতেছিল, সুশীলা তাহা দেখিল; মনের অন্ধকার দূর করিতে আপনার মনেই বলিল—না, না—তা'ও কি হয়! নিশ্চয়ই তিনি এখনি আসবেন। আমি একা থাক্‌ব—দূর! দেরী করবেন না; এখনি আস্‌বেন!

কদম ঘরে ঢুকিয়া বলিল—আসুন মা, ওগুলো খুলে দিই!

মুকুরে সেই ছবি!—সুন্দর, সুন্দর, অতি সুন্দর! তাহার এই রূপেই, এই বেশেই, আজ থাকিতে ইচ্ছা হইল। যদি অন্ত বস্ত্র

পরিধান করিলে কিছুমাত্র সৌন্দর্য্যেরও হানি হয়, সুশীলার বেশ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইল না।

—মা।

—না কদম! থাকৃগে, আজ আর আমি পারছি নে!

কদম অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল। তাহার মা সেই সময়েই তাহাকে লেখা-পড়া শিখাইয়া, গীত-বাদ্যে পারদর্শিনী করিয়া ধনীর গৃহে সঙ্গিনীর কাজে ঢুকাইয়া দিয়াছিল। পঁচিশ বছরের কদম বড় লোকের বাড়ীর বধূ কন্যাগুলিকে কি ভাবে বশ করিতে হয় তাহা ভালরূপেই জানিত।

বলিল—তার আর কি হয়েছে মা! ঐ কাপড়েই না হয় থাকৃলে! আর কাপড়খানায় তোমাকে খুবই ভাল মানিয়েছে মা!

এ সকল স্তুতি-বাক্যে মন দিবার মত মন সুশীলার ছিল না, কোন কথা না বলিয়া খাটের বাজুতে হাত রাখিয়া ক্লান্ত দেহখানি এলাইয়া দিল।

কদম বিছানার সবুজ-রঙের চাদরখানা আর একবার ঝাড়িয়া, পরিষ্কার করিয়া দিল।

—তুমি যাও কদম!

—আচ্ছা মা, চল্লুম; যদি দরকার পড়ে, ডেকো মা। আমি ওদিকের বারান্দার ধারের ছোট ঘরটাতেই থাকৃব।

—আচ্ছা।

সুশীলা কক্ষের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। কক্ষের ছাদ হইতে কাচের পুষ্পিত-লতা পাতাগুলি নামিয়া আসিয়া মধ্যপথে আলো হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে; আলো ত নয়, যেন শত সূর্য্য জ্বলিতেছে; জানালা দিয়া মৃদু মন্দ হাওয়া আসিয়া, মুক্তার, সল্মা চুমকির কাজ-করা পর্দাগুলিকে

দোলাইয়া দিতেছে, দেশ বিদেশের সৌন্দর্য্যে সুশোভিতা নারীমূর্ত্তিগুলি সজীব হইয়া একাগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে; শুভ্র শয্যা তাহার সুকোমল বক্ষ বিছাইয়া আলিঙ্গনোদ্যত—কিন্তু সুশীলার চক্ষে এ সকলের কোনটাই পড়িল না।

সুশীলা এধার ওধার করিয়া বেড়াইতে লাগিল; কোথাও একটু শব্দ হইয়াছে কি হয় নাই সুশীলা ঘাড় বাঁকাইয়া সিংহিনীর মত দাঁড়াইয়াছে; ঐ কি? না, না, ও ত পায়ের শব্দ নয়। তবে? রাত্রি অনেক হইল যে! তবে কখন আসিবেন? এই সুন্দর, সুসজ্জিত কক্ষ, এই লক্ষ্য সূর্য্যের আলোক, স্তবকে স্তবকে কুসুমদাম এ সবই যে মিথ্যা মনে হইতেছে, সব যে ছুঁড়িয়া আছড়িয়া ভাঙ্গিতে ইচ্ছা হইতেছে! ওগুলাকে লইয়া সে কি করিবে? তাহারা ত তাহার সঙ্গে কথা কহিবে না, আদর জানাইবে না, সান্ত্বনা দিবে না, ভালবাসিবে না—উহারা থাকিল গেল তাহার কি!

সে যে তাঁহাকেই চায়। প্রথম মিলনের মধু রজনী। সে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র তাহাকেই চাহে; তাঁহার মুখের হাসি, কণ্ঠের ভাষা, বক্ষের আশ্রয় এই যে তাহার শুধুই কাম্য!

প্রাচীর বিলম্বিত দীর্ঘ ঘড়ির পেণ্ডুলাম দুলিতে লাগিল, কাঁটাগুলা অলস মন্থর গতিতে অগ্রসর হইয়া চলিল—নিকুঞ্জের দেখা নাই। অত বড় বাড়ীটার কোথায় টু শব্দ নাই, ঐ ঘড়িটাই কেবল টক্‌টক্ করিয়া শব্দ তুলিয়া তাহার জাগরণের সাক্ষ্য দিতেছে।

সুশীলা ক্রমেই অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছিল। রাগে ক্ষোভে সে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। এত কি কাজ যে তাহার আর শেষ হইতেছে না? পৃথিবীতে কাজই বড়, আর সব কিছুই নয়? তাই যদি হইল, দরকারী কাজ না সারিয়া আসিতে পারিবেন না, বলিয়া দিলেই ত হইত।

তাহা হইলে সে ত তবু খানিকটা নিশ্চিন্ত হইয়া একটা বহি-টহি খুলিয়া বসিতে পারিত! সুশীলা খাট ছাড়িয়া উঠিল। সব কটি জান্‌লা, দরজা, আলমারি ডেস্কের সামনে দিয়া ঘুরিয়া আসিল—যদি অন্যমনস্ক থাকিতে থাকিতে তাহার পায়েরই শব্দ পায়!

সুশীলা একখানা সোফায় শ্রান্তদেহ বিস্তৃত করিয়া বসিল; সোফার পাশের ক্ষুদ্র টিপয়ের উপর একটি শ্বেত প্রস্তরের রমণী মূর্ত্তি রক্ষিত ছিল, রমণী ত্রস্তভাবে কি একটা জিনিষ কুড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন—এই ক্ষুদ্র বিষয়টিকে ভাস্কর কি আলৌকিক সৌন্দর্য্য-শ্রীই না দিয়াছে—সুশীলা হাতে তুলিয়া সেইটাই পরীক্ষা করিতে গেল কিন্তু নিজ হৃদয়ের রসহীনতা শিল্পীর অসামান্য প্রতিভাকে গ্রহণ করিতে পারিল না। মনে হইল কেবলমাত্র বিবসনা নারী মূর্ত্তি আঁকাই ভাস্করের উদ্দেশ্য, ঘৃণায় লজ্জায় সেটাকে যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া চক্ষু ফিরাইয়া লইল।

খট্—খট্—খট!

সুশীলা নিঃশ্বাস রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল! আনন্দের বিদ্যুৎ-শক্তি তাহাকে দ্বার সম্মুখে টানিয়া লইয়া গেল। নিশ্চয়ই তিনি। রুদ্ধ ব্যথা মুহূর্ত্তে পরমানন্দের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

কম্পিত বক্ষে, কম্পিত হস্তে সুশীলা দ্বারটিকে সজোরে খুলিয়া দিল।

নিকুঞ্জ হইলে দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিতেন, সেই প্রেম-তরল চক্ষু, হিল্লোলিত তনুলতা, রূপনদীতে স্নান করিয়া এক অপূর্ব শ্রীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে! সে রূপ, রমণীর সেই বিশ্ববিমোহন শ্রী একমাত্র প্রেমই দান করিতে পারে! কিন্তু হায়। দ্বারে যে করাঘাত করিয়াছিল, সে ওঃ!—নিকুঞ্জ নয়, সিধু খানসামা!

সিধু বলিল—বাবু বলেছেন, আপনার ঘরে গরম দুধ দিতে, এখন আনব কিংমা?

সুশীলা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

কথা কহিবার শক্তি তাহার ছিল না। যে অদম্য কৌতূহল, যে আকুল আগ্রহ, অপূর্ণ তৃষা বুকে লইয়া সুশীলা দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল তাহা যখন চূর্ণীকৃত হইয়া গেল তখন তাহার অধরে ভাষা ছিল না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। মূহূর্ত্তের জন্য একবার উন্মাদিনীর মত তাহার চোখ্ দু'টা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; একবার—একবার চাকরটাকে দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল—কোথায় তিনি? কি কাজে ব্যস্ত তিনি? কখন আসিবেন তিনি?—কিন্তু কোনটাই তাহার কণ্ঠে যোগায় নাই। সিধু চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ সেই উন্মুক্ত দ্বার-পথে অন্ধকার-ঢাকা শূন্য বাড়ী খানার দিকে চাহিয়া চাহিয়া সুশীলা বিছানায় আসিয়া বসিয়া পড়িল। বালিসটাকে বুকের নীচে চাপিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত পড়িয়া রহিয়া, সুশীলা সেটাকে দূর করিয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

দৃষ্টি পড়িল, শিশু-কাঠের কাল-পালিস-করা টেবিলটার উপর। কাগজ কলম, ব্লটিং প্যাড সবই আছে। ইচ্ছা হইল একখানা চিঠিতে ঐ প্রশ্ন কটা লিখিয়া ভৃত্যের মারফৎ পাঠাইয়া দেয়। এখনি ত সে দুধ লইয়া আসিবে, প্রভুর নিকট পৌছিয়া দিবে!

সেই ভাল!

সুশীলা টেবিলের সামনে বসিল।

কিন্তু কি পাঠ লিখিবে? 'শ্রীচরণেষু' না 'প্রিয়তম' কি লিখিবে? শ্রীচরণেষু পড়িয়া তিনি খুসী হইবেন, না প্রিয়তম লিখিলেই বেশী সন্তুষ্ট হইবেন!

আচ্ছা চিঠি পড়িয়া তিনি ত বিরক্ত হইতে পারেন! সব কথাতেই ত তাহাকে তিনি ছেলে মানুষ বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন। চিঠি

পাঠাইলেই ত তিনি বলিবেন—আহা ছেলে মানুষ কি-না! একটুক্ষণ কাজে গিয়াছি, আর এত কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে! আহা!

নাঃ ।

সুশীলা বুকের ভার নামাইবার চেষ্টায় একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিল—সাড়ে ন'টা!

সুশীলা খাটে আসিয়া বসিল। যে বালিসটাকে এই মুহূর্ত্ত দূর করিয়া দিয়াছিল, সেইটাকেই টানিতে যাইতেছে, সিধু গলার সাড়া দিয়া ঘরে ঢুকিল!

রূপার পিরীচের উপর রৌপ্য-পাত্রে উষ্ণ দুগ্ধ আনিয়া বেতের ছোট টেবিলটা টানিয়া কর্ত্রীর সামনে রাখিল। আলনা হইতে ধোপদস্ত তোয়ালে একখানি আনিয়া টেবিলের ধারে রাখিয়া চলিয়া গেল।

সুশীলা গ্লাসটা হাতে তুলিয়া দেখিল তখনও ধোঁয়া উঠিতেছে, মুখে দিতে সাহস করিল না—হাতে লইয়া বসিয়া রহিল; দৃষ্টি ঘড়ির কাঁটায় আছে, কাণ দু'টি প্রিয়ের পদ শব্দ চুম্বনের আশায় উৎকর্ণ, সুশীলার হাতের দুধ ঠাণ্ডা হইয়া গেল, লক্ষ্যও রহিল না।

দশটা বাজিল!

সিধু অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া একটু বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; দ্বারের বাহিরে থাকিয়া মাথাটা বাড়াইয়া দিতেই, সুশীলার দুধের কথা মনে পড়িয়া গেল।

সিধু গ্লাস লইয়া যাইবার সময় দ্বারটি বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিল। সুশীলা বলিতে যাইতেছিল, খোলা থাক্—লজ্জা আসিয়া কথা উচ্চারণ করিতে দিল না। সুশীলা শয্যা ছাড়িয়া সোফায় আসিয়া বসিল। সেই ভাস্কর্য্য-শিল্পের দিকে চক্ষু পড়িতেই সে স্থানটাও ভাল লাগিল না, ঠিক ঘড়িটার সামনে একখানা গদীমোড়া চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল।

ঘড়ির কাঁটা তাহার সে তীব্র দৃষ্টি সহিয়াও নড়িতে লাগিল, ঘুরিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে ঘড়িতে এগারটা বাজিল। সুশীলা চক্ষের উপর দেখিতেছে, ছোট কাঁটাটা এগারোটার ও বড়টি বারটার ঘরে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া, আর ঘড়ি বাজিতেছে, তবুও ক'টা বাজিতেছে তাহা সে গণিয়া জানিয়া লইতে চাহিল। এক দুই তিন করিয়া এগার গোণা যখন শেষ হইল তখন সে হৃতশাবক সিংহিনীর মত দাঁড়াইয়া উঠিল।

তাহার নিঃশ্বাস উষ্ণ হইয়া উঠিল; নাসিকা কপোল রক্তিম-রূপ ধারণ করিল, শ্বাস রোগীর মত বক্ষস্পন্দন দ্রুত হইয়া তাহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে বাধা জন্মাইতে লাগিল, চক্ষু হইতে একাধারে জ্বালা ও হতাশের অভিমান ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সুশীলা বন্ধ দ্বারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

কোথাও কোন সাড়া নাই। এত চাকর-বাকর, নায়েব গোমস্তা এত লোকপূর্ণ বাড়ী খানা, সামনের ঐ বাগানটা, তাহার ওদিকের অত বড় রাস্তাটা সব বুঝি আজ মহানিদ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া আছে! একটা ঝিল্লির ডাক-ও নাই কেন!

সারাদিনটা ত বাজে-বাজে বাহিরে বাহিরে কাটিয়াছে, রাতও ত বারটা বাজে, আর কতটুকু রাতই বা আছে। ঐ ছোট কাঁটাটা ঐটুকু পথ নামিয়া পাঁচটার ঘরে ত এখনি আসিয়া পড়িবে, প্রভাত হইয়া যাইবে, প্রথম মিলন রাত্রি পলায়ন করিবে—কিন্তু......

তিনি ত আসিলেন না!

সুশীলার কান্না পাইল, আসিলেন না ভাবিয়া নয়, আর আসিবেন না ভাবিয়া, সুশীলা কাঁদিয়া ফেলিল। আসিবেন না! আসিবেন না! সুশীলা অঝোরে কাঁদিল।

ঘড়ির দিকে চাহিল, একটা!

না, না, না !

ক্ষোভে, হতাশায়, লজ্জায়, অভিমানে সুশীলার অশ্রুও বন্ধ হইয়া গেল। সুশীলা আসন ছাড়িয়া আবার গালিচার উপর দিয়া নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতে লাগিল। দু'পা চলে, ঘড়ির কাঁটার দিকে চাহিয়া প্রথম মিলন রাত্রির কতটুকু বাকী আছে হিসাব করে ; আবার চলে !

তবে কি তাঁহার অসুখ হইল ? তিনি হয়ত কোন কাজে বাহিরে গিয়াছিলেন, হয়ত কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রজলিত অগ্নি-শলাকার মত চিন্তাগুলি সুশীলার মাথার মধ্যে ঢুকিয়া যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে লাগিল !

নিশ্চয়ই তাহাই হইয়াছে ! তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। সেখানে হয়ত সেবা করিবার কেহ নাই, যত্ন করিবার কেহ নাই, তিনি হয়ত যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছেন !

সুশীলা এ চিন্তা সহিতে পারিল না, ছুটিয়া আসিয়া ঝনাৎ শব্দে দ্বার খুলিয়া ফেলিয়া শূন্য অন্ধকারের দিকে চাহিল। এতটুকু আলো নাই, কোথা দিয়া, কেমন করিয়া আলো জ্বালা যাইতে পারে তাহাও জানা নাই, সুশীলা অন্ধকারের পানে চাহিয়া নিষ্ফল গর্জন করিতে লাগিল।

সুশীলা দুই পা অগ্রসর হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। একতলের কোন একস্থানে একটি আলো জ্বলিতেছে ; সেই আলোতেই দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ির গায়ে গোল কাঠের রেলিঙের সূচনা দেখা যাইতেছে—সুশীলা আরও দুই পা সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। হিসাব করিয়া দেখিল, সিঁড়িটা এই বারান্দার শেষেই আসিয়া মিলিয়াছে ; অন্ধকারে হাতড়াইয়া এটুকু সে অক্লেশেই চলিয়া যাইতে পারিবে। সিঁড়ি নামাও শক্ত নয়, কিন্তু......

তারপর ?

সে কি করিবে ? নীচে গিয়া খোঁজ করিবে কোথায় তিনি ! কিন্তু কোন্ দিকে যাইবে ?

সুশীলা আরও কয়েক পা অগ্রসর হইয়া কাশ্মীরি বারান্দার রেলিঙের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। নীচে চাহিয়া চাহিয়া কোন্ দিকে চলিয়া কোথায় পৌঁছিবে স্থির করিতে পারিল না। এত বড় বাড়ীটার সব দিকে যাইবার আসিবার কোন পথই সে চিনে না,—কি করিয়া যাইবে ?

যদি নীচে নামিয়া রাস্তা না খুঁজিয়া পায়, যদি সারা বাড়ীটা সে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হায়রাণ হইয়াও তাঁহার দেখা না পায়, ফিরিতেও না পারে – তখন ?

আর সেই সময়েই যদি তিনি আসিয়া পড়েন।

সুশীলার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

সুশীলা ধীরে পা ফেলিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু......

ঐ যা ! দু'টা যে কখন্ বাজিয়া গেছে !

মা-গো !

সুশীলা অতি কষ্টে মাতৃনাম স্মরণ করিয়া দু'হাতে গলা চাপিয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

বিছানায় পড়িয়া ভাবিতে তাহার বড় কষ্ট হইতেছিল ! আর কষ্ট হওয়ার অপরাধই বা কি ! প্রথম মিলনের মধুময়ী রাত্রি ! সে কি বিস্ময়ঘন পুলকময়, সে কি উজ্জ্বল, কি বিচিত্র সুন্দর ! সে কি অন্ধ-আকুল আবেগভরা, অনাস্বাদিত, অননুভূত অমৃতময় তাহার উন্মাদনা। যেন সে কোথায় আপনাকে বিলাইয়া দিতে চায়,—কোথায় জানে না ; যেন কাহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া আঁখি দৃষ্টি হীন হইয়া যাইতেছে, অন্ধ হইতেছে—সে নাই ; নব-সৌন্দর্য্য, নব তৃপ্তির আশায় দেহ-মন নাচিয়া

নাচিয়া উঠিতে চাহে, দেহের সকল অঙ্গ, মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কৌতুক করিয়া বেড়াইতে চায়—সে আসে না। এই সাড়াহীন, শব্দহীন, আলোহীন নিশীথে প্রাণ যেন কাহার মুখে মাথা রাখিয়া নীরবে নিরালায় নিরতিশয় সুখে অতিবাহিত করিতে চায়, সে নাই।

সুশীলার অমল তনুখানি দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। সে-যে আর এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারিতেছে না। প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত তাহার গলায় পা তুলিয়া টিপিয়া মারিতে চাহিতেছে, সুশীলা কি করিবে!

ঢং ঢং ঢং!!!

সুশীলা দাঁড়াইয়া উঠিল। চীৎকার করিতে গেল, কদম। কণ্ঠে স্বর নাই।

সিধু।—অবাধ্য কণ্ঠ সে নামও মুখে আনিতে দিল না।

আর কার নাম সে জানে না।

না জানুক, তাহার ইচ্ছা হইল, খুব একটা চীৎকার করিয়া সে বাড়ী-শুদ্ধ লোককে ডাকিয়া তোলে; তারপর চাকর-বাকর যাহারা তাহাকে দেখিতে ছুটিয়া আসিবে তাহাদের নিকট হইতে কেবল এই সংবাদটুকু জানিয়া লইবে যে, তিনি ভালই আছেন।

আর কিছু না।

তাঁহার যেন কোন অসুখ হয় নাই, সুস্থ শরীরেই আছেন, এই সংবাদটুকু পাইলেই সে রাত্রির মত নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে। কিন্তু......

তিনি কি ভাবিবেন?

যদি তিনি এই বাড়ীরই কোন অংশে থাকেন, কাজে নিযুক্তই থাকুন আর নিদ্রিতই থাকুন—যদি থাকেন, চীৎকারে তিনিও ত উঠিয়া পড়িবেন, আসিয়া দাঁড়াইবেন—তিনি কি বলিবেন?

তিনি কি সেই কথাই বলিবেন না? তিনি কি তাহাকে অধিকতর উপেক্ষার চক্ষেই দেখিবেন না? তিনি কি তাহার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইবেন না?

না—সুশীলা প্রাণ থাকিতে এমন কিছুই করিতে পারিবে না যাহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হন, বিরক্ত হন্!

কিন্তু এরূপ দুশ্চিন্তার কবল হইতেই বা পরিত্রাণ পায় সে কিরূপে যে তিনি অসুস্থ হন্ নাই। তাঁহার সেবা করিবার লোক কেহ কাছে নাই; সকল যন্ত্রণা তিনি একা নীরবে প্রাণ বাহির করিয়া সহ্য করিতেছেন! এ সংবাদটুকু যে তাহার চাই-ই যে তিনি সুস্থ আছেন, তাঁহার কিছু হয় নাই!

এ খবরই বা কে তাহাকে দিয়া নিশ্চিন্ত করিবে! বাড়ীখানার কোন অংশে কোন প্রাণী যে জাগিয়া আছে, তাহার ত আভাষও পাওয়া যাইতেছে না!......

সুশীলা রেলিঙটায় ভর দিয়া নীচের পানে ঝুঁকিয়া পড়িল। ডাকিবে, যাহাকে হোক্, যেমন করিয়া হোক সে ডাকিবেই। ঐ একটা প্রশ্ন করিবে, আর কিছু না।—ঐ একটা প্রশ্ন!

চীৎকার করিতে গিয়া সুশীলা থামিয়া গেল। অন্তরযামী জানেন, থামিতে তাহার হৃদপিণ্ডটাই ছিঁড়িয়া আসিবার উপক্রম করিল।

কিম্বা যদি তাই হয়!—ওঃ!

সুশীলা কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরে ঢুকিয়া ভূ-তলে বিস্তৃত গালিচার উপর আছাড় খাইয়া পড়িল।

যদি এমন হয় যে তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিবার ইচ্ছাতেই তিনি নিজে না আসিয়া, তাহাকে শুইতে পাঠাইয়া দিয়াছেন—তাই যদি হয়! নগুদা'র অভিসম্পাৎ যদি সত্য হয়—ওঃ ভাবিতেও যে তাহার

অঙ্গ স্থবির হইয়া যায়! কিন্তু কিন্তু—যদি তাই হয়! যদি—যদির কথা কেহ বলিতে পারে না, যদি...

তবে ত চীৎকার করিয়া সেই লজ্জাকর কাণ্ডটাই বাড়ীসুদ্ধ লোককে ডাকিয়া দেখাইয়া দিবে! ছিঃ সে যে বড় বিশ্রী হইবে!

আর তিনি?

না জানি কি ভীষণ দুঃখই পাইবেন! না, সুশীলা তাহাও পারিবে না।

...সে কিছুই করিবে না। নীরবে নির্জনে, নিজের মনে, নিজের প্রাণে এই মর্মন্তুদ যাতনা সহিবে; নিশি শেষে যদি সে বাঁচিয়া থাকে, তাহার কষ্টের ইতিহাস তাঁহাকে চক্ষের দৃষ্টি দ্বারা, বক্ষের স্পন্দনে, মুখের শুষ্কতায়, চোখের জলে জানাইয়া দিবে, আর কিছুই সে করিবে না। সে সহিবে, সহিতেই ত নারীর জীবন, সুশীলাও ত নারী, নারীত্বের সব অধিকার সে পাইয়াছে, সহ্য করিবে!

কতদিন? যতদিন জীবন দেহচ্যুত না হইবে—ততদিন!

কতদিন? যতদিন তিনি স্বেচ্ছায়, সানন্দে তাহার মন্দির দুয়ারে আসিয়া না দাঁড়াইবেন—ততদিন!

পারিবে না?

নারী বৈধব্য সহ্য করিতে পারে আর এটা সহিতে পারিবে না?

পারিবে!

সুশীলা উঠিয়া দ্বারটি ঠেসাইয়া দিল, আস্তে আস্তে অর্গল টানিয়া দিল। মুখ ফিরাইতে সেই প্রকাণ্ড স্বর্ণখচিত মুকুরে স্বীয় প্রোজ্জ্বল মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সেই সুন্দর কান্তি, সুন্দর রহিয়াছে; সেই সুগৌর কম্র আনন—সুন্দর, কম্র; মণি-মাণিক্য-ভূষিত নারী-হৃদয়—অক্ষুণ্ণ অটুট!

কেবল চোখ দু'টিতে কি-যেন নাই। কি যেন ছিল,–কি যেন হারাইয়া সে দু'টি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে!

সেই!!!

ঢং ঢং ঢং ঢং!

ত্রস্তা নারী উন্মুখ হইয়া ঘড়ির দিকে চাহিল। আর নিমিষে তাহার সেই গৌর দেহের উপর গাঢ় কালিমা লিপ্ত হইয়া গেল। আর ত রাত্রি নাই! জানালার পর্দা ভেদ করিয়া আকাশের আলো ঢুকিয়া পড়িতেছে—উষার সমাগম হইয়াছে! সুশীলা ছুটিয়া জানালার সামনে আসিয়া দু'হাতে পর্দা সরাইয়া দিল; চঞ্চল হাতের সে আকর্ষণ রেশমী পর্দা সহিতে পারিল না, শব্দ করিয়া ছিঁড়িয়া গেল।

সুশীলার তাহাতে লক্ষ্য নাই। সে তখন দূর হইতে দূরান্তরে দৃষ্টি পাঠাইয়া দেখিতে চাহিতেছিল, আকাশের সে আলো সত্যই উষার আভাষ জ্ঞাপন করিতেছে কি না; সত্যই তাহার প্রথম মিলন-রাত্রিটিকে ব্যর্থ বিফল করিয়া দিয়া বিশ্বাসঘাতিনী রজনী পলায়নপরা কি-না!

কোন ভুল নাই, ওগো, কোন ভুল নাই—শুব্ধ আঁধার আকাশের কোল উজ্জল করিয়া যিনি দেখা দিয়াছেন, তিনি উষা! চন্দ্র নয়, নক্ষত্রদীপ্তি নয়, চক্ষের ভ্রম নয়—উষা! উষা! উষা! সুশীলা গো, উষা!

ঐ সুদূরে তারার দল নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছে, আর তাহাদের দেখাও যাইতেছে না—সব শেষ!

সব শেষ! রাত্রি শেষ আর সে একা এই সুদীর্ঘ রজনী অতিবাহিত করিয়াছে। এ যে ভাবিতেও কষ্ট হয়; মিথ্যা বলিয়া মনে হয়!

এ যে কান্না পায়! চোখের জল ত বাধা মানে না। এ যে পার্বত্য নদীর মত শব্দ করিয়া ঢেউ তুলিয়া অঝোরে ঝরিয়া পড়ে! সর্বাঙ্গ

যে প্রাণ-ভাঙ্গা ভাঙ্গনে ভাঙ্গিয়া যায়! অশ্রুর যে শেষ নাই, যন্ত্রণারও যে অন্ত নাই! সুশীলা বুকখানা চাপিয়া ধরিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িল।

ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা বাজিল।

ঐ ঘড়িটার শব্দ মাত্রেই তাহাকে যন্ত্রণা দিতেছিল, সারারাত দিয়াছে, এখনও তাহার শব্দে প্রাণটা খাঁ খাঁ করিয়া উঠিল। চক্ষু মেলিয়া দেখিল, ঘর-ময় আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যে আলোর সঙ্গে দীর্ঘ রাত্রি ধরিয়া সে পরিচয় করিয়াছে সে আলো এ নয়; এ আলো বাহিরের, দিনের! সে আলো সুশীলা সহিতে পারিল না। সে আলোর সঙ্গে এমন একটা দীর্ঘ রাত্রির অভিশপ্ত ইতিহাস জড়াইয়া আছে যাহা মনে করিতেও সুশীলার কান্না পায়। সুশীলা সার্শি খুলিয়া জানালার খড়খড়ি কটাই বন্ধ করিয়া দিল।

তারপর টলিতে টলিতে বিছানায় আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। চরণের এতটুকু শক্তিও ছিল না যে তাহাকে ধরিয়া রাখে; মাথায় এতটুকু ক্ষমতাও ছিল না যে তাহাকে দাঁড়াইতে দেয়! সুশীলা শ্রান্ত অবসন্ন দেহটাকে শয্যায় ফেলিয়া দিল।

সেই শয্যা! সুন্দর, শুভ্র, পরিচ্ছন্ন!

সুশীলা সেই অস্পৃষ্ট-সুন্দর শয্যার দিকে দিকে মুখ চাপিয়া কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল; এক স্থানে অধিকক্ষণ মুখ রাখিতে পারে না, সমস্ত বিছানাটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া, সুশীলা একটা বালিশ টানিয়া মুখ গুঁজিল। তারপর, তাহার মনে হইল, বালিশটা জ্বলিয়া উঠিয়া তাহার মুখখানাকে একেবারে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিল।

আর মনে নাই।

আট-টা বাজিতে জাগিয়া উঠিয়া দেখে, বালিশটা ভিজিয়া জপ্‌ জপ্‌

করিতেছে। এত অশ্রু তাহার অজ্ঞাতে তাহারই চক্ষু বহিয়া পড়িয়াছে। গা-টা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

বন্ধ দুয়ার জানালা ভেদ করিয়া সূর্য্যের রশ্মি ইলেক্ট্রিক আলো-গুলিকে বিবর্ণ করিয়া দিয়া ঘর আলোকিত করিয়া দিয়াছে; কাকের দল ভীষণ চীৎকার করিতেছে—সুশীলা উঠিয়া বসিল।

অঙ্গে সেই রাত্রির পোষাক; সেই মণি-মুক্তার অলঙ্কারগুলি। পোষাকটাকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইল; এ সকল গহনা সাপের জিব বাহির করিয়া দংশনোদ্যত হইয়াছে, খুলিতে পারিলে বাঁচে কিন্তু এমন সামর্থ্য নাই যে কোন ইচ্ছাই সে কার্য্যে পরিণত করে।

কদমের উপর তাহার রাগ হইল, সে কেন তাহাকে জাগাইয়া দেয় নাই। সে-যে নিজের হাতে দ্বারের অর্গল বন্ধ করিয়াছে তাহা তাহার মনে ছিল না; কদম যে খুব প্রত্যুষ হইতেই তাহার দ্বারের সামনে বসিয়া তাহার জাগরণ প্রতীক্ষা করিতেছে তাহাও সে জানিত না, নিজের মনের রাগে লজ্জায় সে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

দ্বার খুলিয়া কদমকে ডাক দিতে ইচ্ছা হইয়াছিল কিন্তু প্রথম ব্যর্থ মিলন-রাত্রির জাগরণ-ক্লান্ত মুখখানা তাহাকেও দেখাইতে মাথা কাটা যাইবে অনুমিত হইতে লাগিল—ডাকা আর হইল না। যেমন বসিয়া ছিল, তেমনি করতলে মাথা রাখিয়া বসিয়া রহিল।

কিন্তু...

যদি তিনি সত্য সত্যই অসুস্থ হইয়া থাকেন?

না। তাহা কখনই সম্ভব নয়। নিশ্চয় তাহা হইলে এতক্ষণে বাড়ীর লোকে জানিতে পারিত এবং সে সংবাদ তাহাকে দিতেও বিলম্ব করিত না। না, সারারাত্রি যে অসুখের ভাবনা ভাবিয়া সে কষ্ট পাইয়াছে, তাহা কখনই সত্য নয়। কিন্তু...

না। সুশীলা আর ভাবিতে পারিবে না। শেষে কি পাগল হইয়া যাইবে !

ঢং !

সাড়ে আট-টা বাজিয়া গেল।

দরজায় ঘা পড়িল।

সুশীলা উৎকর্ণ হইয়া রহিল। কার হাতের এ শব্দ ?

তাঁহার ?

না। তাহা হইলে তাহার হৃদয় ঝঙ্কার দিত।

আবার !

সুশীলা গাত্র-বসন সংযত করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

---মা।

— সুশীলা 'ও-হ্'—আছাড় খাইয়া শয্যায় পড়িয়া গেল।

---মা। অনেক বেলা হল যে !

সুশীলা শয্যা ছাড়িয়া উঠিল; পাছে দ্বার খুলিতেই কদম তাহার মুখের পানে চাহিয়া দুঃখময় কাহিনীটা পড়িয়া ফেলে, পিছন দিকে মুখ করিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

কদম ঘরে ঢুকিয়া বেশ সহজ ভাষায় ও ভাবে একনিশ্বাসে কহিয়া দিল—বাবু দু'বার নিজে এসে খোঁজ করে গেছেন; আবার এইমাত্র সিধুকে খবর নিতে পাঠিয়েছিলেন। ও-হরি, এমন দামী পর্দাটা ছিঁড়লে কে গো ! নিশ্চয় সিধে মুখপোড়া ! মুখে আগুন, মুখে আগুন !

সিধু নয় কদম, আমি ছিঁড়েছি।

দশম পরিচ্ছেদ

শেষ হইলেই ভাল হয়

শ্রান্ত, ক্লান্ত অবসন্ন দেহটিকে লইয়া সে যখন স্নান কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন তাহার অনাবৃত রক্তকমল সদৃশ চরণ দু'খানির পানে চাহিতে কদমের প্রাণটা যেন জুড়াইয়া গেল। অনেক সুন্দরী মেয়ের পা সে দেখিয়াছে কিন্তু এমন সুশ্রী সুষ্ঠু, পাতলা পাতলা দু'খানি পা সে আর দেখে নাই। সেই পা দু'খানি দেখিলে সে পা যাহার, তাহার রূপ তখনই মনের মধ্যে অনপণেয় বর্ণে চিত্রিত হইয়া যায়।

সুশীলা কদমকে একান্তমনা দেখিয়া লজ্জারাঙা মুখে বলিয়া উঠিল চল-না কদম।—তাহার শঙ্কা হইতেছিল বুঝি যে করুণ দুঃখময় ইতিহাস-টিকে সে গোপন করিতে চায় সেইটিই কদম তাহার মুখ হইতে খুঁজিয়া লইতেছে। তাড়াতাড়ি নামিয়া যাইতে পারিলে বাঁচে।

তাড়াতাড়ি নীচে যাইবার ইহাই একমাত্র কারণ নয়; সুশীলার প্রাণটা পরাণ-প্রিয়কে দেখিবার জন্য, তাঁহার মুখের কথা শুনিবার জন্য তরঙ্গসঙ্কুল সাগর-বক্ষের মতই উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহার কিছু হয়, নাই সুস্থই আছেন, ইহা সুশীলা ঠিকই বুঝিতেছিল তবুও তাহার উষ্ণ মস্তিষ্ক তাঁহার নিকট কি যেন জানিবার আশায়, শুনিবার আকাঙ্ক্ষায়, পাইবার প্রত্যাশায় আকুলিবিকুলি করিতেছিল। একান্তে, সুনির্জনে তাঁহাকে পাশে না পাইলে যেন একটি মুহূর্ত্ত আর সে থাকিতে পারিতে-ছিল না।

কদম সুশীলার পৃষ্ঠবিলম্বিত চুলগুলির মধ্যে হাত পুরিয়া ইতস্ততঃ নাড়িয়া বলিল—মাথা যে ভিজে রয়েছে মা।

ও কিছু না, শুকিয়ে যাবে'খন, কদম।

কদম দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। তবে একটা কিসের চিন্তায় তাহার মুখখানি সহসা যেন শুষ্ক হইয়া গেল, সুশীলা তন্ময়চিত্ত ছিল, লক্ষ্য করিতে পারিল না।

নীচে নামিয়া কদমই সিধুকে জিজ্ঞাসিল—বাবু এসেছেন সিধু?

অনেকক্ষণ। ঘরে আছেন। মা'র দেরী দেখে...

কদম পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইয়া সুশীলাকে বলিল—যাও মা।

সুশীলার সামনেই ভোজন-কক্ষের দ্বার। দু'পা চলিলেই তাহার সম্মুখীন হওয়া যায় কিন্তু সেই দু'পা চলিতেই সুশীলার সদ্যঃস্নাত রক্তাভ আনন অপরাহ্ণের ফুলটির মত পাংশু হইয়া গেল।

দ্বার খোলাই ছিল এবং মুক্ত দ্বার-পথে দৃষ্টি পড়িতেই নিকুঞ্জের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ সুশীলার চক্ষে পড়িল। যে প্রিয়-সন্দর্শন আশায় সিক্ত কেশপাশ ভাল করিয়া মুছিবার সময়ও সুশীলা করিতে পারে নাই, বহুক্ষণের অদর্শন যাহাকে মর্ম্মে মর্মে পীড়িত করিতেছিল, তাঁহারই অপেক্ষায় তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াও সুশীলার পা উঠিল না। সুশীলার মুখখানি নত হইয়া পড়িল, দু'টি চক্ষু জলভারে ঝাপসা হইয়া গেল।

"যাও মা। বাবু ত ভেতরেই আছেন।"

নিকুঞ্জ অন্যদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, এই শব্দ শুনিবামাত্র এদিকে ফিরিলেন। হর্ষোজ্জ্বল মুখে তিনি দ্বারের দিকে আসিতে আসিতেই বলিলেন—এস সুশীলা!

সুশীলার পা উঠে না।

নিকুঞ্জ বাহিরে আসিয়া সুশীলার হাত ধরিলেন। কদম ও সিধু প্রভুর পদশব্দ শুনিয়াই অন্তরালে চলিয়া গিয়াছিল।

সুশীলাকে ঘরের মধ্যে আনিয়া নিকুঞ্জ স্নেহস্বরে কহিলেন—রাতে ঘুম হয়েছিল ত সুশীলা ?

এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস ! এ কি প্রশ্ন ?—এ যে মৃত্যু-বাণের মত অন্তরে বিঁধিয়া গেল।

সুশীলা মুখ তুলিল, মুহূর্ত্তের জন্য তাহার আরক্ত নয়নদ্বয় নিকুঞ্জের মুখের উপর রাখিয়া সুশীলা কি যেন বলিতে চাহিল কিন্তু পারিল না ; অকস্মাৎ দুই চক্ষু দিয়া দর দর ধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

নিকুঞ্জ মূঢ়ের মত ক্ষণকাল বসিয়া থাকিয়া, নিঃশব্দে সুশীলাকে কাছে টানিলেন।

সিধু চায়ের ট্রে হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে বিদায় দিতেই বলিলেন—রেখে যাও !

সিধু বাহির হইয়া গেল। নিকুঞ্জ সুশীলাকে টেবিলের কাছে দাঁড় করাইয়া স্বহস্তে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ফিরিয়া আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে নিকুঞ্জর মুখ দিয়া একটি শব্দও নির্গত হইল না।

সুশীলা দু' হাতে মুখ ঢাকিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতেছে, আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে অশ্রু গড়াইয়া লাল সিমেণ্টের মেজের উপর বিন্দু বিন্দু ঝরিয়া স্থানটিকে ভিজাইয়া তুলিয়াছে।

নিকুঞ্জ সেই হাত দু'খানি ছাড়াইতে চেষ্টা করিবামাত্র সুশীলা দেহের শক্তি হারাইয়া চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িল।

"কাল তুমি এলে না কেন ?"

কথা ক'টা অতি সামান্য সন্দেহ নাই কিন্তু প্রত্যেক শব্দটা যেন মানুষের হৃদয়ের রক্ত দিয়া ভিজান ! এ কথা যেন কাহারও কণ্ঠের নয়, সুশীলার হৃদপিণ্ডটাই প্রশ্ন করিল। সুশীলার অশ্রু ভারাক্রান্ত চোখ দু'টা জ্বলিতে লাগিল !

সুশীলা—যেন সে সুশীলাই নয়!

এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই পল্লীবালিকা সুশীলা এক উদ্দাম যৌবন-শ্রী বিমণ্ডিতা পূর্ণাঙ্গী নারীতে রূপান্তরিত হইয়া গেল।

সুশীলার সে নম্রতা আর নাই; সন্ত্রস্ত ভাবটাও অন্তর্হিত হইয়াছে; বালিকাসুলভ সরলতাও নাই; প্রশ্ন করিয়া দুইটি জ্বালাময়ী দৃষ্টি মেলিয়া সে উত্তর চাহিতেছিল।

—তুমি কি আমায় খুঁজেছিলে সুশীলা?

এ কি প্রশ্ন!

—তুমি ত আমায় ডাক-নি সুশীলা! ডাক্‌লে আমি যেতুম!

—ডাক্‌লে?

—নিশ্চয়!

সুশীলার বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল। সে বলিতে চাহিল, না ডাকিলে আসিবার সম্পর্ক কি তাহাদের নয় কিন্তু কথাটা এত বড় আর তাহার বাক্‌শক্তি এত অল্প যে সে কথাটা কিছুতেই বলিয়া ফেলিতে পারিল না।

—তুমি কি ডাকিয়েছিলে?

—না।

—তবে?

সুশীলা ঠকাস করিয়া টেবিলের ধারটায় মাথা রাখিয়া বসিল; যে অশ্রুর উৎস তাহার মুখখানাকে ভাসাইয়া দিতেছিল তাহা যেন পৃথিবীর একটি প্রাণীকে দেখাইতেও সে মরমে মরিয়া যাইতেছিল।

আবার না দেখাইলেও যে নয়! এ সে কি শুনিল? স্বামীর মুখ হইতে, তাহার দেবতার মুখ হইতে এ সে কি কথা শুনিল? সে ডাকে নাই, তাই তিনি সারা রাত্রি তাহার নিকট আসেন নাই; অন্যত্র ছিলেন,

কি করিতেছিলেন—কে জানে? নিজের মুখে বলিলেন—ডাকিলে আসিতেন!—কই এমন কথা ত কোনদিন সে কাণেও শোনে নাই; বিশ্বজগতে আর কোন স্বামী কোন স্ত্রীকে ইহার পূর্বে এ-কথা বলিয়াছেন বলিয়াও ত জানা যায় নাই। স্ত্রী ডাকিবে স্বামীকে, তবে তিনি আসিবেন? সেই কি সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে?

সুশীলার বুকই বলিয়া দিতে লাগিল, না, না, সে সম্বন্ধ তাহাদের নয়। এই মিথ্যা লোকাচারের সম্বন্ধ তাহাদের নয়।—সুশীলার বুকখানি ভয়ে ভাবনায় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

তিনি অসুস্থ ছিলেন, বিশেষ কাজ পড়িয়াছিল, কোন আকস্মিক বিপদ ঘটিয়াছিল—এর যে কোন একটা শুনিলেও যে ইহাপেক্ষা শতগুণ শান্তি পাইত সে; কিন্তু এ কি শুনিল?

মনে হয় ভুল শুনিয়াছে; মনে হয়, তিনি রহস্য করিয়া বলিয়াছেন; মনে হয়, এইবার মুখ তুলিয়া চাহিলেই তাঁহার রঙ্গ-রাঙা মুখ দেখিতে পাইবে, তাহার সর্বদুঃখের অবসান হইয়া যাইবে; মিথ্যা ভয়-ভাবনার অবসান হইয়া যাইবে!

সুশীলা বড় আশায় মুখ তুলিল কিন্তু হায়! তাহার বড় আশায় ছাই পড়িয়া গেল, সুশীলা দু'হাতে গলাটা চাপিয়া ধরিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তবে রঙ্গ নয়, ব্যঙ্গ নয়, রহস্য নয়, পরিহাস নয়—সত্য! যে মুখে হাসি দেখিয়া নিশ্চিন্ত নির্ভয় হইবার আকুল আগ্রহে নারী মুখ তুলিয়াছিল, সে মুখ দেখিয়া নারী আর এতটুকু আশাও হৃদয়ে ধরিতে পারিল না!

মনে হইল, এখনই বুঝি তাহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত আগত হইবে, সর্ব দেহ তাহার যন্ত্রণায় অবশ শিথিল হইয়া আসিতেছে!—মৃত্যু ভয়ে

ভীতা নারী আর একবার মুখ তুলিয়া বিশ্ব-সংসারটাকে, শেষবারের মত দেখিয়া লইতে চক্ষু তুলিতেই দেখিল, স্বামী উদাসনেত্রে জানালার পানে চাহিয়া স্থির নিশ্চল মৃন্ময় মূর্তিটির মত বসিয়া আছেন!

দেখিয়াই অন্তরটা জ্বলিয়া উঠিল। নির্বাণোন্মুখ দীপ যেমন দপ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে, তেমনি করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মুখ চোখ দিয়া আগুন ছুটিতে লাগিল। তাহার নিজেরই ভয় হইল, এ আগুনে বুঝি সে-ই পুড়িয়া মরিবে! আগুন! তাহার যে সর্বাঙ্গে আগুন।

অগ্নি-শ্বাসের স্পর্শেই নিকুঞ্জ এদিকে ফিরিয়াছিলেন, যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় স্পন্দনও স্তব্ধ হইয়া গেল।

চক্ষে চক্ষু মিলিতেই সুশীলা বলিয়া উঠিল—এই যদি তোমার ইচ্ছে ছিল, কেন তুমি আমায় এমন করে' লোভ দেখিয়ে, ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিলে?

নিকুঞ্জ নির্বাক, নিস্পন্দ!

এত দয়া দেখাতে কে তোমাকে বলেছিল? আমরা ত বলিনি! এত দয়া দেখিয়ে এমন করে পুড়িয়ে মেরে তোমার সুখ হয়?

নিকুঞ্জ তবুও নির্বাক!

সুশীলার সন্দেহ হইল—এই সেই লোক ত, না আর কেহ তাহাকে ছলিতে আসিল! সন্দেহ হয়, সত্য সন্দেহ হয়!

সেই লোক—যে একদিন বলিয়াছিল, সুশীলাকে পাই, জীবন রাখব; না পাই, জীবন ত্যাগ করব! সেই লোক—যে বলিয়াছিল, আমার ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো; আমার শুষ্ক নদীতে ভরা জোয়ার; আমার নীল-আকাশের শারদ-জ্যোৎস্না তাকে পাই আবার সংসার পাতব; না পাই—এ জীবনের মত সব শেষ! সেই লোক—যে তাহাকে দেখিবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডাক-বাঙলোর হাতায় বসিয়া

কাটাইত! সেই লোক—যে তাহাকে পাইবার জন্য দিনকে দিন করে নাই, রাত্রিকে রাত্রি দেখে নাই! সেই লোক্—যাহাকে জীবনের ধ্রুবতারা জ্ঞান করিয়া সুশীলা প্রেমময় নগুকেও ত্যাগ করিতে পারিয়াছিল! সেই লোক—যাহাকে সুখী করিবার জন্য, যাহার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য সে বার্দ্ধক্য বরণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। সেই লোক—এ, আশ্চর্য্য!

তবে কি সব মিথ্যা! এ প্রেম-আলাপন আগাগোড়াই অভিনয়! সত্যের লেশও কোথায় নাই!—কিন্তু, অভিনয়, মিথ্যা এ সব কথা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না ত! প্রাণ ত বিশ্বাস করিতে চায় না, পারে না! বিশ্বাস করিতে গিয়া সে-যে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে!

বিশ্বাস না হোক, ভাঙ্গিয়া পড়ে, পড়ুক—কিন্তু এ মিথ্যা! নিশ্চয়ই মিথ্যা! যতখানি মনে আছে, তাহা মিথ্যা। যাহা মনে নাই, তাহাও মিথ্যা! ইহার মূলে কোথাও সত্য নাই!

সেই স্নেহ-জ্ঞাপন মিথ্যা, সেই আদর মিথ্যা, হৃদয়-রাণী করিবার প্রস্তাব মিথ্যা! সেই ব্যথাতুর দৃষ্টি মিথ্যা, সেই আকুলিত প্রেম-নিবেদন, তাহাও মিথ্যা! একটা প্রচণ্ড মিথ্যা, তাহার শাখা, প্রশাখা, লতা পাতা বিস্তার করিয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে! মিথ্যা লোভ দেখাইয়া, মিথ্যার কুহকে প্রতারিত করিয়া, মিথ্যা-মোহে ভুলাইয়া আনিয়া কে-যেন তাহাকে এক শুষ্ক গভীর অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়াছে! মিথ্যা সকলি, মিথ্যা নয় কেবল এই গভীর অন্ধকূপের গভীরতা আর এই নিক্ষেপণ! সর্ব অঙ্গে সে বেদনা এখনও টন্ টন্ করিতেছে!

শুধু কি সেই প্রতারিত হইয়াছে? তাহার খুল্লতাত, তাহার খুড়ীমা, তাহার জননী—না প্রতারিত হইয়াছে কে? কে জানিত, মিথ্যাও এমন সুন্দর হয়! কে ভাবিয়াছিল, সেই সুন্দর-মিথ্যার পিছনে

এমন জঘন্য কুৎসিৎ সত্য আছে! কে মনে করিয়াছিল, সেই লোক এমন করিয়া ঠকাইবে!

পারিয়াছিল বুঝিতে, একজন! সে নগেন্দ্র। এই বিবাহে একমাত্র সেই আপত্তি করিয়াছিল; অভিশাপ দিয়াছিল। আজ যে তাহারই কথা বর্ণে বর্ণে ফলিয়া যাইতেছে। বড়লোকের বাড়ীতে সে ক্রীতদাসী হইতে আসিয়াছে। স্ত্রী নয়, সহধর্মিণী নয়, ক্রীতদাসী মাত্র। এমন ক্রীতদাসী হয়ত আরো অনেক আছে। তাহারা হয়ত সকলেই তাহার মতই বিরহ-দগ্ধ নিশা যাপন করিয়া থাকে।—সুশীলা এতক্ষণে আবার কঠিন ধরা স্পর্শ করিল; এতক্ষণ সে যেন এ জগতে ছিল না, আবার কাঁদিয়া ফেলিল; দৃষ্টিহীন চক্ষু মেলিয়া স্বামীর পানে চাহিতেই অশ্রু উৎসাকারে বাহিরিয়া তাহাকে ভাসাইয়া দিতে লাগিল।

নিকুঞ্জ ধীরে, সস্নেহে বামহস্তখানি তাহার পৃষ্ঠে রক্ষা করিতেই লাঙ্গুলস্পৃষ্টা ফণিনীর ন্যায় গর্জাইয়া উঠিয়া, সুশীলা বলিল—আমায় তুমি বিয়ে করনি?

নিকুঞ্জ নিরুত্তর।

—কর নি?

নিকুঞ্জের নীরবতা তাহাকে অধিকতর পীড়া দিল।

—এই যদি তোমার মনে ছিল না করলেই পারতে।

নিকুঞ্জ তবুও নির্বাক; অন্তরযামীই কেবল বলিতে পারেন, নিকুঞ্জের মনের ভিতরে তখন কি মত্ত তুফানই বহিতেছিল।

সুশীলা তাহা বুঝে নাই। তাহার মনে পড়িল, কাকাবাবুর মুখের সেই কথা, রাজার ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান তাঁহাদের জামাতা। কিন্তু সুশীলার তা'তে কি। আর মনে পড়িল, নগুদার সেই অভিশাপ। এ বিয়ে টাকার সঙ্গে, বিষয়ের সঙ্গে, গয়নার সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে মানুষের নয়।

—তোমার টাকার সঙ্গে ত আমার......

—না, না সুশীলা। ওকি তুমি বলছ সুশীলা। ও কথা কি বলতে আছে?

সুশীলা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিল—বলতে নেই?

—না।

—তবে......

নিকুঞ্জ বলিলেন—শোন সুশীলা...

নিকুঞ্জ থামিতেই সুশীলা ব্যগ্র দৃষ্টিতে চাহিল।

নিকুঞ্জ বলিলেন—সুশীলা, দোষ আমার! কিন্তু তোমাদেরও দোষ আছে।

দোষ! কি দোষ! সুশীলা যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না।

তোমার কাকা রাধাচরণ বাবু এই বলেছিলেন, সুশীলা বিয়ে হলেই সন্তুষ্ট থাকবে। ছেলে মানুষ সে, আর কিছুই সে চাইবে না; তোমার মা'ও তাই বলেছিলেন। তাঁরা দু'জনেই আমাকে বুঝিয়েছিলেন, সুশীলা আমার ঘরের লক্ষ্মী মেয়েটির মত থাক্‌বে...

সুশীলা রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসিল—কি?—ঘৃণায় তাহার সর্বাঙ্গ সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল।

নিকুঞ্জ কহিলেন—যেন তুমি এ বাড়ীর একটি মেয়ে; চিরদিন...

—এ বাড়ীর কে আমি?

নিকুঞ্জ সভয়ে কহিলেন—মেয়ে!

সুশীলা সবেগে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, ইচ্ছা হইতেছিল প্রবল চীৎকার করিয়া এই মাত্র যে জঘন্য কথাটা শুনিয়াছে সেটাকে ডুবাইয়া চাপিয়া মারিয়া ফেলে!

নিকুঞ্জ তৎপূর্বে কহিলেন—সুশীলা আমি তাই চেয়েছিলাম!

আগুনের হল্কার মত সুশীলা প্রশ্ন করিল—কি?

—তুমি একটি ছবির মত, একখানা গানের মত আমার সামনে সামনে থাকবে; তোমায় সুন্দর মুখখানি দেখতে দেখতে আমি তন্ময় হয়ে যাব; সুশীলা, তুমি হবে আমার চক্ষের তৃপ্তি, হৃদয়ের শান্তি সুশীলা!—তিনি সুশীলার হাত ধরিলেন।

—আমিও ত তাই চাই—অস্পষ্টকণ্ঠে কথা কয়টি বলিয়া সুশীলা নিকুঞ্জের কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলিল।

সত্যই ত ইহার বেশী কি তাহার চাহিবার আছে? কিছু না! সে ত ইহাই চায়! তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে, তাঁহার সঙ্গে হাসিয়া, তাঁহার সঙ্গে গল্প করিয়া, তাঁহার সেবা করিয়া, তাঁহার দাসী হইয়াই থাকিতে সে চায়; বিনিময়ে সে কত কি-ই না দিতে ইচ্ছা করে? তাহার মন প্রাণ, তাহার জীবন, তাহার সর্বস্ব সে দিতে চায়! নিজের জন্য কিছুই না রাখিয়া একেবারে নিঃস্ব রিক্ত হইয়া সে যে আপনাকে দান করিতেই চায়। এই জীবন-যৌবন, এই রূপ সৌন্দর্য্য, এই সেবা-কোমল হাত দু'খানি সে-যে কেবল তাঁহারই সমীপে উৎসর্গ করিতে আসিয়াছে। বিধাতা যে কেবলমাত্র এই ভারটুকুই তাহাকে দিয়াছেন; ইহাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য, এক ব্রত। এক কিন্তু অসীম; এক কিন্তু বিপুল, এক—তবু এক নয়!

শুধু দিতে নয়, দিয়া ধন্য হইতে সে চায়! শুধু দানের উদ্দেশ্যেই দান নয়, দানের স্বার্থকতা যে ইহাতেই! দিতে না পারিলে তাহার জীবন ব্যর্থ, বিফল হইয়া যাইবে; দিতে না পারিলে ব্যর্থ নারীজন্ম তাহার শেষ হইয়া যাইবে।

সুশীলা এই কথাগুলাই যে নিবেদন করিতে চায়! বলিতে চায় যে নারী যাহা দিতে পারে তাহার সবই ও দু'টি চরণে উৎসর্গ করিতে সে

চায়। তাহার নারী জন্মের সার্থকতা, তাহার যৌবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাহার জীবনের সব কামনা বাসনা দিতেই ত'সে আসিয়াছে! ওগো নিঠুর, নির্মম গো! সবই যে তোমার জন্য, সবই যে তোমার জন্য! তুমি না লইলে বাসি ফুলের মত সে-যে ধূলায় লুটাইবে; অনাদৃত, অনাঘ্রাত কুসুম ধরণীর করুণাহীন বক্ষে শুকাইয়া যাইবে!

নিকুঞ্জ সুশীলার একখানি হাত হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া স্নেহ গদগদ কণ্ঠে ডাকিলেন—সুশীলা তুমি রাগ করেছ?

সুশীলার চিন্তা-জাল ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া গেল।

রাগ নয়; অভাগিনী রাগ করে নাই, করিতে পারে নাই; দুঃখে তাহার হৃদয় পিশিয়া যাইতেছিল।

—কেন তুমি এ কথা আমায় আগে বল-নি?

—কোন্ কথা সুশীলা?

—আমায় তুমি ভাল বাস্‌বে না?

—সে কি সুশীলা! তোমায় আমি ভাল বাসব না?

—তবে কেন ও-সব কথা বল্‌ছ?......

হঠাৎ কথা বলিতে বলিতে থামিয়া সুশীলা নিকুঞ্জের দুই কাঁধের উপর দুই খানি হাত রাখিয়া বুকের উপর মাথা লুঠাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল—বল, ও সব কথা আর বলবে না? বল বল, আমায় ভাল বাসবে?

নিকুঞ্জ কি বলিতে গেলেন, সুশীলা বাধা দিল।

—বল, আদর করবে? বল—আমি যেমন ভালবাসি, বল, তেমনি ভাল বাসবে? আর কোন কথা নয়। বল ভালবাসবে?

—সুশীলা!

—বলবে না?—

চোখ ফাটিয়া জল ঝরিল।

নিকুঞ্জ গাঢ়স্বরে বলিলেন—সুশীলা, দোষ আমারই! আমারই, আমারই, আর কার নয়। আমারই দোষ।—বলিতে বলিতে নিকুঞ্জের কণ্ঠের স্বর কণ্ঠেই লয় পাইল।

—কেন?

সুশীলা সোজা হইয়া বসিয়া, তীর্য্যক দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—কেন বল? কোন কথা গোপন কর' না—বল। আমার কাছে কেনই বা গোপন করবে তুমি। আমি ত তোমার স্ত্রী।—সুশীলা একবার লক্ষ্য করিয়া স্বামীর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখখানি দেখিয়া লইয়া, তারপর বলিল—আমি ত তোমার সুশীলা, তুমি ত আমায় ভালবাস, বল?

নিকুঞ্জ নিরুত্তর।

চাহিয়া চাহিয়া সুশীলার দৃষ্টি ক্লান্ত হইয়া পড়িল; সুশীলা চক্ষু নামাইয়া লইল কিন্তু রৌদ্রোজ্জ্বল সুসজ্জিত কক্ষ, পুষ্পাধারে শোভিত শুভ্র বসনাচ্ছাদিত মেঝে, রৌপ্যপাত্র পূর্ণ খাদ্যসমূহ—কিছুই সে চক্ষে দেখিতে পাইল না—আবার মুখ তুলিল; চক্ষু যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিল।

কোন উত্তর নাই।

সুশীলার হৃদপিণ্ড শীতল হইয়া আসিল; নিঃশ্বাস টানিতে বেদনা বোধ হইতেছিল; সুশীলার হাত পা ক্রমেই সব অসাড় হইয়া আসিতেছিল, অশ্রুপূর্ণ চোখ দুইটা ক্রমশই শুষ্ক হইয়া পাষাণ দেহ ধরিবার উপক্রম করিতেছিল।

—শোন সুশীলা!

সুশীলা জোরে নিঃশ্বাস টানিয়া, স্বামীর পানে চাহিল।

নিকুঞ্জ বামহস্তদ্বারা সুশীলাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া গাঢ়স্বরে কহিলেন, শোন সুশীলা বলি। তুমি যে আমার কাছে ভালবাসা প্রত্যাশা করবে

তা কি আমি জানি-না সুশীলা আমার! জানি। কিন্তু সে ভালবাসা আমি যে তোমাকে একটি মাত্র সর্ত্তে দিতে পারি সুশীলা! একটি মাত্র সর্ত্তে!

সুশীলার প্রাণটা ছ্যাঁক্ করিয়া উঠিল। সর্ত্ত! কেন সর্ত্ত? কিসের সর্ত্ত? ভালবাসার আবার সর্ত্ত কি! সে ত অমনিই ভাল বাসিয়াছে, আরও বাসিবে, যতখানি বাসিয়াছে তাহার শতগুণ, সহস্রগুণ ভাল সে বাসিবে কিন্তু সর্ত্ত ত নাই! সুশীলা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

—সুশীলা, প্রাণাধিকে, সে ভালবাসা আমি তোমাকে দিতে পারি আমার প্রাণের সর্ত্তে!

লেখাপড়া-জ্ঞান সুশীলার বোধোদয়ের সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই, প্রাণের সর্ত্ত কথাটা সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না।

বলিল—আমি যে কিছুই...

—বুঝতে পারছ না! পারবে, আগে সব বলি শোন, সুশীলা! সুশীলা, আমায় দেখে তোমার কি খুব বুড় বলে মনে হয়?

না—না।

হয় না?

না।

—হবে। কিন্তু আমার জীবনের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

—না, না...

শোন সুশীলা! সন্ধ্যা যখন আসে, সূর্য্যের আলো যেমন টুপ্ করে ডুবে যায়, আমার জীবনের সূর্য্যও তেমনি টুপ্ করে ডুবে গেছে; সূর্য্য ডুবলেও যেমন কিছু আলো আকাশের গায়ে ছড়িয়ে থাকে, আমার জীবনের আকাশে এখন যে আলো দেখ্‌ছ সেও সেই সূর্য্য ডুবে যাওয়ার পরের আলো।

সুশীলার বুক ধড়ফড় করিয়া উঠিল।

নিকুঞ্জ বলিতে লাগিলেন—কাম, ক্রোধ, দুঃখ শোক এর কোনটা সইবার ক্ষমতা এ জীর্ণ দেহে আর নেই। যে কোন সময়ে একটু উত্তেজনা, একটু অধিক চাঞ্চল্য এ জীবনের শেষ করে দিতে পারে!

এ কি ভয়ঙ্কর কথা! সুশীলার হাত পা যে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে।

—এ শুধু আজ নয় সুশীলা। আজ দশবছর এমনি ধারা করে এ জীবন চলে আস্‌ছে। সুশীলা, কোন আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা আমায় ছাড়তে হয়েছে, কি-জানি যদি কোন সময়ে তাই থেকেই কোন বিপদ ঘটে; বিষয়-আসয়ের কাজ পরের হাতে তুলে দিয়েই আমায় সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে, কি-জানি যদি কোন কারণে রাগের উদয় হয়। সুশীলা, একদিকে এই বৃদ্ধের জীবন, অন্যদিকে তোমার প্রার্থনা!

সুশীলা ভাবিতেছিল, সে কি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে! কি বিশ্রী স্বপ্ন এ! সমস্ত প্রাণটাকে কাটিয়া কুটিয়া শত ভাগ করিয়া ফেলিতেছিল।

নিকুঞ্জ স্খলিত বচনে বলিলেন—সুশীলা তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে হলে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হয়; বল তুমি কি চাও? বেশ সহজ স্বচ্ছন্দ মনে বল সুশীলা কি চাও, ভালবাসা? তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই সুশীলা! বল তুমি—যা চাও, তাই পাবে! তার জন্য যদি এ বৃদ্ধের জীবনও দিতে হয়—দোব সুশীলা, তাও দোব! বল তুমি কি চাও?

সুশীলা পাষাণ হইয়া গিয়াছিল; অথবা স্বপ্নের প্রশ্ন, উত্তর দিতে পারিল না। প্রশ্নটাই থাকিয়া থাকিয়া পাষাণে-রেখার মত চিক্ চিক্ করিয়া উঠিতেছিল—বল সুশীলা, কি চাও—বল!—কি চাও তুমি বল! অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর কিছুই সে ভাবিতেও পারিল না। সুশীলা তীক্ষ্ণ অথচ মৃদু কণ্ঠে বলিল—কেন কেন, তবে করলে?

এ-কথা সুশীলা বলিতে চায় নাই ; সে নিজের মনেই নিজেকে এই প্রশ্নটা করিয়াছিল ! এ সমস্যা তাহার নিজের কাছেই ; মীমাংসাও সে নিজে করিতে চাহিয়াছিল কিন্তু অসতর্ক জিহ্বা অতি নিম্নস্বরে কথা ক'টা উচ্চারণ করিয়া ফেলিল।

চক্ষের সামনে নিজের, আজন্মের, পিতৃপুরুষের বাসগৃহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইতে দেখিলে, একটির পর একটি কক্ষ ছাইয়ে পরিণত হইতে দেখিলে, পায়ের নীচের ধরণী অগ্নির লেলিহান জিহ্বা বাড়াইয়া সর্বগ্রাস করিতে উদ্যত দেখিলে মানুষের যে অবস্থা হয়, সুশীলারও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। যেন সে জীবন-নদীর তটপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একটি তরঙ্গের অপেক্ষা—তারপরই সব শেষ ! সব অবসান !

মরণোন্মুখ ব্যক্তি যেমন চরম সময়ে একবার অতীত জীবনের পানে চাহিয়া শিহরিয়া উঠে, সুশীলাও তাহার জীবন-কঙ্কালের পানে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—বিয়ে করলে কেন তবে ?

—তোমাকে বড় ভাল লেগেছিল সুশীলা ! সমুদ্র বক্ষে জ্যোৎস্নার মত, কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্য্যের মত, নীল জলে পদ্মের মত, সুশীলা... সুশীলা...

এ কথাগুলার মধ্যে অগ্নি প্রচ্ছন্ন আকারে লুকাইয়া ছিল, সুশীলাকে দগ্ধ করিয়া দিতে লাগিল। সে মাথাটা নীচু করিয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিল।

—সুশীলা, আমারই ভুল। ভেবেছিলাম, তোমাদের দেশে তুমি যেমন তোমাদের সংসারের কাজ-কর্ম ছাড়া কিছুই চাইতে না, এখানে এসেও তুমি এই ঘর-সংসার এই সাজ-সজ্জা আসবাব পত্র নিয়ে থাকতে পারবে !

সুশীলা প্রাণপণ শক্তিতে কালামুখ চাপিয়া ধরিতেছিল ! হায় রে, কাণ দু'টাকেও যদি সে এমনি ঢাকিতে পারিত !

—বাড়ী, গাড়ী, মোটর, গয়না—সুশীলা...

—কে চায় তোমার গাড়ী মোটর। আমি ত চাই না। আমি যে কেবল...

সুশীলা ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

—আমি যে কেবল তোমাকেই চেয়েছিলাম।

সুশীলার বিকম্পিত দেহখানি চেয়ার হইতে লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল। নিকুঞ্জ স্নেহে, যত্নে ধরিয়া ফেলিলেন।

কক্ষমধ্যে পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। প্রখর সূর্য্য কিরণ কক্ষতলে লুটাইয়াছে ; রৌদ্রতপ্ত বাতাস পর্দ্দাগুলায় নাড়া দিয়া টেবিলের উপর আধারে রক্ষিত ফুলগুলার পাঁপড়িতে আসিয়া লাগিতেছে—নিকুঞ্জের বাহুর উপর দেহ এলাইয়া সুশীলা নিমীলিত নেত্রে পড়িয়া আছে, জ্ঞান আছে কি নাই তাহা জানা যাইতেছে না।

জ্ঞান ছিল।

সুশীলা ভাবিতেছিল, এ তাহার কি হইল ? নিজের স্বামীর মুখে সে কি কথা শুনিল ? স্বামীর ভালবাসা, তাহার নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য ধন সে পাইবে, বৈধব্যের বিনিময়ে ! স্বামী তাহাকে ভালবাসিলেই, তাহাকে স্বামীহারা হইতে হইবে ! কি নিদারুণ এ সংবাদ !

প্রেম ও মৃত্যু !

না—এ চিন্তাই যে মৃত্যু-যন্ত্রণা দিতেছে।

যন্ত্রণা কাতর মুখে, জাগিয়া উঠিয়া সুশীলা বলিল—তোমার কি কেউ ছিল না ? বোন্, মেয়ে, আত্মীয়া ?—কেউ না ?

—কেউ না সুশীলা, কেউ না ! এ অভাগার তিনকূলে কেউ ছিল না।

—তাই, আমাকে...

সুশীলা সে চিন্তামাত্রেই শিহরিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। কিন্তু বেশীক্ষণ

সে স্তব্ধ থাকিতে পারিল না ; জীবন-মরণের সমস্যা সম্মুখে লইয়া নীরব থাকিতে তাহার প্রাণটাই দম বন্ধ হইয়া মরিয়া যাইতেছিল।

বলিল—তাই আমাকে তুমি...

—সুশীলা, দয়া কর, দয়া কর। তোমার মুখ থেকে একটি শক্ত কথা শুনলে আমি মরে যাব। দোহাই তোমার।

—কিন্তু...সুশীলার চোখ্ কাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

"—আমি বলছি, সুশীলা তোমাকেই আমি চেয়েছিলাম কারণ এত সুন্দর আমার চোখে কোন মেয়েই বোধ হয় নি। অনেক দিন আমি এই বাড়ীটার বাইরে পা দিইনি সুশীলা! কতদিন জান? পাঁচ ছ' বছর। যখন একমাসের ভেতরে স্ত্রী, তিন-তিনটে ছেলে-মেয়ে সব ছেড়ে গেল, এবাড়ীর বাইরে আমি পা বাড়াই নি, মানুষের মুখ দেখি নি, আমি, তাইতেই শরীর ভেঙ্গেছিল। ডাক্তার বল্লেন, জলভ্রমণ করতে। তিন মাস একাদিক্রমে নদীতে নদীতে ঘুরে বেড়ালাম। নিজের বোটের ক'টি লোকছাড়া আর একটি প্রাণীর মুখ এই তিন মাসে দেখি নি, দেখ্তে চাইওনি। হঠাৎ একসময়ে মানুষ দেখবার জন্যে প্রাণটা ছট্‌ফট করে উঠ্‌লো, কিন্তু নদীর কূলে গ্রাম নেই ; চলেইছি, গ্রাম আর চোখে পড়ে না ; শেষে একদিন ভোরে রাধাচরণ বাবুকে দেখ্তে পেলুম। তিনি নদীতে ছিপ ফেলে মাছ ধরছিলেন। সেইখানেই বোট লাগাই। তার পর, ঠিক যখন নদীর জল লাল করে পূর্বাকাশে সূর্য্য উঠ্‌ছিলেন, সূর্য্যের দিকে চাইতে গিয়ে দেখি একটি মেয়ে। সূর্য্য তার কাছে যেন ম্লান, অতি ম্লান হয়ে গিয়েছেন। সুশীলা, সেইদিনই তাকে পেতে প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছিল ; ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলোর মত, শুষ্ক নদীতে জল-প্লাবনের মত, সে মেয়েটিকে না পেলে মনে হয়েছিল, আমার বাঁচা দায় হবে। তা'কে আমি চেয়েছিলাম আর পেয়েও ছিলাম।

—তাকে তোমার কিছুই দেবার ছিল না, জেনেও?

—জেনেও। কিছুই যে ছিল না সুশীলা।

—ওঃ!—সুশীলা মুখ ঢাকিল।

—সুশীলা! এখন বুঝতে পারছি কত বড় ভুল আমি করেছি! যদিও কিছু দেরী হয়েছে আমার বুঝতে, তবু বুঝেছি। বল সুশীলা, কি করলে তুমি সুখী হও, বল, তাই আমি করব। যেমন করে পারি তোমাকে আমি সুখী করবই।

নিকুঞ্জের ঘন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দে সুশীলা ভয় পাইয়া মুখ তুলিল। নিকুঞ্জ বাহ্যজ্ঞানহারার মতই বলিয়া যাইতে লাগিলেন—সুশীলা, বিয়ের মন্ত্র পড়া হয়ে গেলেই কি বিয়ে হয়ে যায়—তোমার ধারণা? আমার ধারণা কিন্তু তা নয়। আমার ধারণা আমাদের বিবাহের মন্ত্র পাঠ করা হলেও এ বিবাহ অসিদ্ধ আছে। সুশীলা, আমি তোমাকে মুক্তি দোব; তোমার বাড়ীতে রেখে আসব; তোমার বিয়ের সমস্ত খরচ আমি বহন করব; যে সমস্ত গয়না এখন তোমার, চিরদিনই তোমার থাকবে। তাই হোক্ সুশীলা, তাই কর, তুমি সুখী হও সুশীলা, তুমি সুখী হও।

সুশীলা কোন কথাই শুনে নাই; আপন চিন্তায় নারী বিভোর ছিল। নিকুঞ্জ কথা শেষ করিয়া তাহার হাত ধরিতেই সুশীলা মাথা তুলিল।

বলিল—তবে যে তুমি একটু আগে বল্লে কাল রাত্রে যদি আমি ডাকতুম, তুমি যেতে? এ তবে সত্যি নয়? তুমি আমায়—আমায়—ভালবাস না?

ভালবাসার কথা বলিতে গিয়া সুশীলা কাঁদিয়া ফেলিল। আর্ত্তস্বরে কথা কয়টি বলিয়া সে দীন নয়নে স্বামীর মুখের পানে চাহিল।

—সত্য কথা বলব সুশীলা?—বিশ্বাস করবে?

—ক-র-বো।

—তোমায় আমি ভালবাসি সুশীলা! একদিকে তুমি, অন্যদিকে নিজের প্রাণ আমার বোধ হয় সুশীলা—এ দু'টিকেই আমি ভালবাসি—সমান ভালবাসি।

সুশীলার হাত তখনো নিকুঞ্জের হাতের মধ্যে আছে; সুশীলার অবশ তনুলতা পুরুষের দীর্ঘ উন্নত দেহের পরেই স্থাপিত; দুইটি বক্ষ, স্বামী স্ত্রীর প্রেমভরা দুইটি বক্ষ পরস্পরের অতি সন্নিকটে—নিকুঞ্জ তাহাকে কাছে টানিলেন।

—সুশীলা, তোমাকে আগেই বলেছি, মানুষের মুখ দেখাও আমি ছেড়েছিলাম। ভালবাসা দূরে থাক, মানুষের সম্পর্কই আমার ছিল না। সে ধারণা আমার বদলায় প্রথম—তোমাকে দেখে। তোমার সৌন্দর্যই আমার কাল হয়েছিল।...

..."তারপর তোমার কাকার সঙ্গে আমার কথা হয়। আমি তাঁকে স্পষ্টই বলি যে ছোট্ট একটি সুন্দরী মেয়ের মত সুশীলা হাসবে, খেলবে, বেড়াবে, আমি দেখে সুখী হব! আমার এই রাজবাড়ীর মতন বাড়ীতে তুমি রাজকন্যার মত খেলা করবে, হাসবে, গান গাইবে, আমার সামনে সামনে ঘুরবে, খেতে বস্‌বো তোমায় পাশে নিয়ে, নিত্য নূতন জিনিষ গয়না, খেলনা, বাজনা—নিয়ে তুমি সুখে থাকবে, এই আমি চেয়েছিলাম। প্রথম যেদিন গঙ্গার ঘাটে তোমায় আমি বার বার দেখি, তোমার লজ্জাহীন, নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার আমাকে বুঝিয়েছিল যে তুমি অতি সরল, সুবোধ। তুমি এই সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে। সুশীলা...

..."কাল প্রথম সে ভুল আমার ভাঙ্গে, কখন জান? ট্রেণে...

..."যখন আমি কাগজ পড়ছিলুম, আর তুমি...

..."তুমি আকুল দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে ছিলে।...

...সেই প্রথম বুঝলুম, মূর্খ মতিহীন বৃদ্ধ যা ভেবেছিল, সব ভুল, সব মিথ্যা, সব ভুল। আর এখন...

...এখন বুঝছি সুশীলা, ভুল ভেঙ্গেছে।...

...এখন তোমাকে ভালবাসা, তোমার প্রেমের প্রতিদান দেওয়াই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য !...

...সুশীলা, প্রাণাধিক্ আমার !

সুশীলার সজল নয়ন মুদিয়া গেল।

..."আমার জীবন—কিছু না ! ক'দিন বেশী আর ক'দিন কম ? এই ত—কিছু যায় আসে না সুশীলা !...

...সুশীলা, তোমাকে ভালবাসার ফলে মৃত্যুই যদি হয় আমি তাই চাই !

সুশীলা প্রাণহীন নির্জীবের মত নিকুঞ্জের বাহুর 'পরে মাথা রাখিয়া পড়িয়া রহিল। কাণে বাজিতে লাগিল, ভালবাসা, ভালবাসা ভালবাসা ! নারী নিঃশেষে যা বিলায়, নারী আমরণ যাহা কামনা করে—সেই ভালবাসা, ভালবাসা, ভালবাসা ! অভিধানে যেন আর কথা নাই, স্বর্গের ভাণ্ডারে ইহাপেক্ষা মধুর অমৃত আর নাই, সৃষ্টি যেন এই কথাটার নীচে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে, ইহাতেই জাগে, ইহাতেই মরে !

শুধু সেই দু'টি স্নেহময় বাহুর স্পর্শ সুশীলা অনুভব করিতেছিল। সেই কণ্ঠের মধুর স্বরই তাহার কাণের মধ্যে লক্ষ বীণার ঝঙ্কার তুলিতেছিল। ক্রোধের পর তন্দ্রার মত, মরুভূমির পর শান্ত শীতল বৃক্ষতলের মত মধুর সেই স্পর্শ, সেই সুর তাহার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সান্ত্বনা দিতেছিল ; সর্বাঙ্গব্যাপী ক্ষতে প্রলেপ দিতেছিল।

এই ত তাহার নারী-জীবন সার্থক হইয়াছে। ভালবাসা সে পাইয়াছে। যেমন-তেমন ভালবাসা নয়, মুখের কথা নয়, আর্তের

প্রতি সান্ত্বনা নয়, প্রকৃত ভালবাসাই সে স্বামীর পাইয়াছে। স্বামী তাহাকে ভালবাসেন, তাহার জন্য, তাহাকে সুখী করিবার জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন দিতে চলিয়াছেন— নারী, নারী আর কি কামনা করিতে পারে? আর কি বাসনা তাহার থাকিতে পারে? স্বামীর প্রেম— সে পাইয়াছে! প্রিয়ার জন্য তিনি আত্মপ্রাণও বলি দিতে পারেন!

মুমূর্ষুর হরিনামের মত, অন্ধের যষ্টির মত নারী এই চিন্তাতেই মগ্ন হইল। ইহার মধ্যে যে কত মধু নিহিত ছিল, কেবলমাত্র নারীই জানে! নারীর বিশ্ববিজয়িনী কামনা নারীকে সুখ-চিন্তায় ভোর করিয়া দিল। আর কি যে তাহার চাহিবার আছে রমণী তাহা কল্পনাও করিতে পারিল না।

স্বামী-প্রেম ছিল তাহার আকাঙ্ক্ষার, পাইয়াছে; প্রেমের প্রতিদান ছিল, তাহার কামনার, পাইয়াছে; ভালবাসা আদর যত্ন স্নেহ সোহাগ নারী যাহা চাহে, যত কিছু চাহে, সব পাইয়াছে, আশাতীতরূপে পাইয়াছে। জগতের আর কোন নারী বুঝি এতখানি পায় নাই; কোন সৌভাগ্যবতীও এত সৌভাগ্য কল্পনা করিতেও পারেন নাই, সুশীলা সেই সকল পাইয়াছে। তাহার মত ভাগ্যবতী নারী বিশ্বে আর কয়টি আছে সে জানে না, জানিতে চায়-ও না, সে নিজেই তুষ্ট, তৃপ্ত, সম্পূর্ণ!

তাহাকে ভালবাসিবার ফলে যদি মৃত্যুবরণ করিতে হয়...

...তাহার স্বামী...

...সুশীলার শোণিত ধমনীতে উষ্ণ হইয়া উঠিল; মাথার ভিতরে মস্তিষ্কটা কয়লার উনানে ভাত ফোটার মত টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল।

সুশীলা ক্ষিপ্রগতিতে উঠিয়া পড়িয়া বলিল—না, না, অমন কথা

তুমি বল না! তাহ'লে আমি কি নিয়ে বেঁচে থাক্‌ব! ও কথা তুমি মুখেও এনো না। তোমার পায়ে পড়ি—সব ভুলে যাও; আমি না বলেছি, সব ভুলে যাও; না, কোন কথা আর তোমায় আমি বলতে দেব না; আমিও বলব না।...

..."কেবল—তুমি যা যা ভেবে ঠিক করে রেখেছিলে, তাই হবে; আমি তাই করব। তার বেশী আমি কিচ্ছু চাইব না, কিচ্ছু না; তোমাকেই আমি সুখী করব, তোমার সেবা করে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখব—আর কিছু না।

..."ও কি, অমন করে ঘাড় নাড়ছ কেন? বিশ্বাস করছ না? এই তোমার পা, তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি—তবু বিশ্বাস করবে না।—সুশীলার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

নিকুঞ্জ কাঁপিতেছিলেন।

সুশীলা বলিল—স্বামী দেবতা, স্ত্রী তার দাসী; সেই দেবতা স্বামী আমার তোমার পায়ে হাত রেখে বলছি, যা বলেছি আমি ভুলে যাব, তুমিও ভুলে যাও; তোমার কাছে কখন কিছু চেয়েছি—আমিও ভুলে যাব, তুমিও ভুলে যাও; তোমার মনে কখন না-জেনে কষ্ট দিয়েছি, জ্ঞানহীনা অবলা বলে ক্ষমা কর, তোমার পায়ে পড়ি, তোমার সুশীলা ভুলে অন্যায় করে ফেলেছে, তাকে ক্ষমা কর—সুশীলা কাঁদিতে মুখ ঢাকিল।

তখনি বলিল—যেমনটি তুমি ভেবেছিলে, আজ থেকে তোমার সুশীলা তাই হবে! তোমার সঙ্গে এ ভাবে কথাও সে কইবে না, কইবে না, কইবে না! কিন্তু—

নিকুঞ্জ সাগ্রহে বলিলেন—কিন্তু কি সুশীলা?

সুশীলা উঠিয়া বসিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল—একটা কথা বলবে?

নিকুঞ্জ সাগ্রহে বলিলেন—বলব সুশীলা।

সুশীলা নতমুখে বলিল—কাল রাত্রে কি করলে, কোথায় ছিলে, বাধা না থাকে যদি...

বাধা—কিসের বাধা সুশীলা? আর যদিও বাধা কিছু থাকে, সে ত তোমার কাছে নয় সুশীলা!

তবে—

নিকুঞ্জ স্খলিতকণ্ঠে কহিলেন—সুশীলা, ক্ষ্যাপা কুকুর দেখেছ কখনও?

দেখিছি। সে কথা কেন?

মনে কর সুশীলা, ঐ বাগানের ফটকটা বন্ধ করে' দিয়ে কে একটা ক্ষ্যাপা কুকুরকে ছেড়ে দিয়ে গেছে! কোথাও কেউ নেই, নিজে ক্ষ্যাপা, সর্বাঙ্গে তার ঘা, পুঁজ রক্ত পড়ছে,—সে কি করবে বল ত সুশীলামণি!

সুশীলা বলিতে পারিল না; তবে তাহার মনশ্চক্ষে যে দৃশ্যটা ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে তাহার ভয়ই করিতেছিল!

নিকুঞ্জ বলিলেন—ভাবতে পারছ কি মণি?

সুশীলা সভয়ে বলিল—সে যে বড় বিশ্রী! একে ত খোলা জায়গাতেই তাদের দেখ্‌লে ভয় হয়, তার ওপর আবার...

নিকুঞ্জ বলিলেন—যদি তোমার ঘরের উত্তর দিকের একটা জানালা খুলে বাগানের দিকে দেখ্‌তে, দেখতে পেতে তেমনি এই ক্ষ্যাপা কুকুরটা সারারাত......

সে কি! না, না, ওমন করে বলতে হবে না। আমি আর শুনতে চাইনে।—সুশীলা নিকুঞ্জের কাঁধের উপর মাথা রাখিল।

নিকুঞ্জ যে দুই হাতে নিজের বুক টিপিয়া একটা অসহ, অবহ বেদনা দমন করিতেছিলেন, সুশীলা তাহা দেখিয়া অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেল;

এবং সে-টা কি বুঝিবার আগেই তাহার মাথাটা ঘুরিয়া গেল, চক্ষে বিশ্ব-জগৎ লুপ্ত হইল। এই যে এখনি শুনিয়াছে, এতটুকু উত্তেজনা, ক্রোধ দুঃখ সহিবার ক্ষমতা তাঁহার জীর্ণ দেহের নাই। তবে কি—

তাহার রমণী জন্মের এই শেষ। আজই তার চূড়ান্ত অবসান?

সুশীলা আর ভাবিতেও পারিল না।

সুশীলার মূর্চ্ছিত দেহখানি কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িল।



একাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বিপ্রহর অতীত প্রায়।

সুশীলা শয়ন-কক্ষের একটা বাতায়ন খুলিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। কতক্ষণ এই ভাবে বসিয়া আছে, সে নিজেই তাহা জানে না। তাহার মন অসাড় হইয়া গিয়াছে, অনুভূতির শক্তি তাহার নাই। দুর্বল মস্তিষ্কে এক একবার কি একটা কথা ভাবিবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু সকল কথার আরম্ভ ও শেষ নিজের মনেই সে হারাইয়া ফেলিতেছিল। বিশ্বের প্রতি এক ক্ষুব্ধ অভিমানে নীরবে হৃদয় তাহার মাঝে মাঝে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল আবার সব যেন কোন্ সুপ্তির অন্তরালে গোপনে লুকাইয়া পড়িতেছিল।

নীল পর্দাটা একধারে ঠেলা রহিয়াছে, মধ্যাহ্নের তপ্ত নিঃশ্বাস থাকিয়া থাকিয়া তাহার নীরব ক্রোধ-মূলে জ্বালা সিঞ্চন করিতেছিল। সুশীলা মাথাটাকে সরাইয়া লইতে চাহিল, পারিল না। দূর দিগন্ত প্রসারিত সূর্য্যোজ্জ্বল নীল আকাশ, তাহার তলে তাহাদের বাগানের বড় বড় বিলাতী পামের উচ্চশিরগুলির মধ্যে এমন-একটা স্নিগ্ধ শান্তির ঢেউ বহিয়া যাইতেছিল যে তাহার অশান্ত হৃদয় পটে সেই-দৃশ্যটা যেন একটা সান্ত্বনার মত হইয়া উঠিয়াছিল।

আজ মধ্যাহ্ন-আহার সে করে নাই। মূর্চ্ছাভঙ্গে, খানিকক্ষণ ঘর অন্ধকার করিয়া শুইয়াও মাথাটাকে সে স্থির করিতে পারে নাই; আহারে তাহার রুচি ছিল না, কদম জেদাজেদি করিয়া অনেক-কষ্টে

একটুখানি পানশে ঝোল খাওয়াইয়া গিয়াছে, এখন মনে হইতেছে সেটা না খাইলেই আরও ভাল ছিল।

মুক্ত বাতায়নের ধারে বসিয়া সুশীলা তাহার স্বামীর কথাগুলা স্পষ্ট করিয়া মনের মধ্যে ফিরাইয়া আনিতে চাহিতেছিল। একটা দিন আর একটা রাত্রি, ইহারই মধ্যে সুশীলার দেহে মনে যে কি বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে তাহাই সে চিন্তা করিয়া ভাবিয়া লইতে চাহিতেছিল। কিন্তু হায়! কোন ইচ্ছাই পূর্ণ করিতে পারিল না। মাঝে মাঝে একটা তীব্র জ্বালা উঠিয়া তাহাকে পুড়াইয়া ঝলসাইয়া দিতে লাগিল; স্নায়ু সমস্ত অচেতন হইয়া পড়িতেছিল, আবার বুঝি চেতনা হারায়, ভয়ে ভয়ে সুশীলা আসন ছাড়িয়া উঠিল।

বড় আলমারীর গায়ে বসান লতাপাতা-আঁকা আর্শির সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে সুশীলা শিহরিয়া উঠিল। এ মূর্ত্তি কি তাহারই? নিজের অপরিচিত মূর্ত্তি দেখিয়া সুশীলার অন্তর গভীর ব্যথায় বেদনায় আড়ষ্ট হইয়া গেল। সকালে যখন সে ঘর ছাড়িয়া নীচে নামিয়া ছিল তখনও সে এই আয়নাখানাতেই নিজেকে দেখিয়া গিয়াছিল, বেশ মনে আছে, এ চেহারা ত তখন সে দেখে নাই। এই কয়েক ঘণ্টা মাত্র ব্যবধান, তাহারই মধ্যে এত কাণ্ডও হইয়া গিয়াছে। এ যে বিশ্বাস করিবার আগে মরিতে ইচ্ছা করে! তাহার গলিত স্বর্ণের মত রঙ, বিবর্ণ পাণ্ডাশ; নির্ম্মল নয়ন-তলে নিবিড় কাল ছায়া; কালো তারা দু'টি কিসের ভারে অবনত; তাহার কিশোর সুকুমার দেহ একদিনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এমন হতশ্রী হইয়া গিয়াছে! সুশীলার বিশ্বাস হইল না। মনে হইল, দুর্বল মস্তিষ্ক কোন চিন্তাই যেমন করিতে পারিতেছে না, দৃষ্টিও তাহার আজ অভ্রান্ত নয়!

সুশীলা কাঁচের অতি নিকটে মুখখানি লইয়া আর একবার

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে চাহিল—এ যে আরো বিশ্রী, আরও কদর্য্য!

তারপর আর সে দেখিতে পাইল না। কোন্ মর্ম্মভেদী দুঃখের করুণ ব্যথায় তাহার দেহের শক্তি, মনের বল লুপ্ত হইয়া গেল; সুশীলা মুদিত নেত্রে শয্যায় বসিয়া পড়িল।

সুশীলা ভাবিতেছিল, এইবার সে ঘুমাইতে পারিবে; ঘুমাইয়া সুস্থ হইবে। নিদ্রাভঙ্গে জাগিয়া উঠিয়া নিজের স্বরূপ মূর্ত্তি কাচে প্রতিফলিত দেখিতে পাইবে। ভাবিয়া সুশীলা চক্ষু মুদিয়া রহিল; কিন্তু ঘুম যে আসে না। দেখিতে দেখিতে সারা বিছানাটাই উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কোন স্থানেই আর আরাম মিলে না। সুশীলা শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে গেল আবার কি ভাবিয়া শুইয়া পড়িল। সব ক'টা উপাধান একত্র করিয়া, মুখে মাথায়, বাহুতলে, পদনিম্নে রাখিয়া চক্ষু মুদিল, তবুও চোখে ঘুম আসে না।

রুদ্ধ অভিমানে তপ্ত বক্ষ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। আপনার বিরুদ্ধে, মাতার বিরুদ্ধে, পিতৃব্যের বিরুদ্ধে, স্বামীর বিরুদ্ধে, বোধ হয় ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও ক্রোধে তাহার সর্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিতে চাহিল। দোষ কাহার? কে তাহার জীবন এমন মরুর মত করিয়া দিয়াছে—কোন দিকে কিছু নাই, সব শূন্য, সব ফাঁকা—কে এমন করিয়াছে! দোষ যে ঠিক কাহার সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার অতীত জীবন কোথায় ছিল, বর্ত্তমানে সেই জীবন কোথায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, ভবিষ্যতেই বা তাহার অদৃষ্টে তাহার জীবন কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে—এ সকল চিন্তাও তাহাকে দংশন করিতে লাগিল। আজ সে যেখানে আছে, যেমন ভাবে আছে—এ তাহার ভাল লাগে না, সব আছে অথচ কিছু নাই, ধনৈশ্বর্য্যের শিখরে বসিয়াও সে কাঙালিনী, পথের

ভিখারিণীরও অধম সে—না, ভাল লাগে না, এ জীবন আদৌ ভাল লাগে না। এই সোনার খাঁচার বাহিরে, কোথায় কি আছে, কি আছে তাহাই সে একবার দেখিতে চায়, জানিতে চায়, বুঝিয়া লইতে চায়।

সুশীলা উঠিয়া বসিল। এক মুহূর্ত্ত উদাস-দৃষ্টিতে ঘরখানার সৌন্দর্য্য দেখিয়া লইয়া শ্রান্ত পদে সে চেয়ারে আসিয়া বসিল। সেখান হইতে সমস্ত বাড়ীটাই দেখা যায়। ঐ ঘড়ি-ঘর, গাড়ীবারাণ্ডা, লাল কাঁকর ছাওয়া পথটি, ঐ কাশ্মীরী বারান্দা, সারি সারি পর্দা ঢাকা ঘরগুলি, মার্বেল পাথরের উপর চিত্রিত পত্র-পুষ্পাদি, বড় বড় ইলেকিট্রক ঝাড় সব সুস্পষ্ট রহিয়াছে, সব যেন জ্বলিতেছে; সৌন্দর্য্য যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে।

এই রাজপ্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা তাহার! তাহার কিন্তু তাহার কি? আনন্দময়, শান্তিময় আবাস গৃহ এ না কারাগার? এই প্রাসাদে সে বাস করিতে আসিয়াছে না তাহাকে বলি দিতে কেহ এখানে পাঠাইয়া দিয়াছে? ঐ ছবি, ঐ আসবাব, ঐ মণি-মুক্তা, জামা কাপড়—সব তাহার পায়ে শৃঙ্খল পরাইয়া দিয়াছে। সুশীলা কোনদিকে চাহিয়া কোন ভরসা পাইল না। সব যেন স্থিরভাবে তাহার দুঃখ উপভোগ করিতেছে, কেহই তাহার নয়, তাহার জন্য মাথা-ব্যথা কাহার হইতেছে না।

সত্যই কি তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল?

মনে হয় যেন হইয়াছিল কিন্তু একটা ভুল কি হয় নাই?

কে জানে! কিন্তু ভাল লাগে না। বিবাহ হইয়াছিল এ চিন্তাও ভাল লাগে না, জীবনটাই বিস্বাদ, তিক্ত, জঘন্য!

তাহার অতীত জীবনে! কি সুখেই না ছিল সে! নদীর বুক

চরিয়া সাঁতার কাটিত, নদীর পূর্ণবক্ষে এতটুকু দাগা না দিয়া তাহার রস-নীর তুলিয়া আনিত; ছোট, ভাঙ্গা সেই ঘরখানিতে সুখে নিদ্রা যাইত; শ্যামল-প্রান্তরে কত প্রভাত, কত সন্ধ্যা গান গাহিয়া বেড়াইত, গাঁয়ের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে কত গল্প, কত হাসি, কত খেলায় সে মাতিয়া থাকিত; বিবাহের যে প্রয়োজন আছে, বিবাহ না করিলে যে জীবন বিফল হয় এ কথা ভাবিবার সময়টুকুও ত তাহার মিলিত না. কিন্তু—তবু সে কি সুখেই না ছিল? আজ যে ব্যর্থ রুদ্ধ জ্বালায় সে জ্বলিয়া মরিতেছে, সে-নারীত্বের আস্বাদ ত বারেকের তরেও সে পায় নাই কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কি সুখেই তাহার বাল্যের, কৈশোরের, যৌবনের প্রথম দিনগুলি কাটিয়া গিয়াছিল।

আর আজ!

সে নদী নাই, সে দূর্বা-ভরা প্রান্তর নাই, সে ছোট ভাঙ্গা ঘর নাই, সে স্বাধীনতা নাই—কিছুই নাই! সে নগু-দাও তাহার নাই!

তবে কি আছে? তার কে আছে? কে বলিয়া দিবে ওগো, তার কি আছে! কে আছে!

সুশীলা এসব কথা আর ভাবিবে না। সে সহজ বুঝিয়াছে, নির্দ্দয় দেবতা তাহাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা লইয়াই সে থাকিবে। তাহার স্বামীকে সে ভালবাসিয়াছিল, পূজা করিয়াছিল, এখন হইতে সে সব ভুলিয়া যাইবে। স্বামীর আদেশ পালন করিবে, দ্বিধাশূন্য হইয়া, অবিচলিত চিত্তে, অবনত শিরে তাহার কর্ত্তব্য করিবে। নারী-জন্ম বিফল হইতে সে দিবে না; স্ত্রীর কর্ত্তব্য না হয় এ জন্মে নাই পারিল সাধিতে, মাতার কর্ত্তব্য, ভগ্নীর কর্ত্তব্য, কন্যার কর্ত্তব্য ত করিতে পারিবে। তাহা হইলেই হইল! আকাশে যদি ঈশ্বর থাকেন, তিনি ত দেখিবেন, তিনি ত বুঝিবেন—সুশীলা কি-না করিয়াছে!

একবার এক নিমিষের জন্য একটা তীব্র বিদ্যুৎ রেখা জ্বলিয়া উঠিয়া আকাশের মেঘ ভরা বুকখানাকে কাটিয়া কুটি কুটি করিয়া দিয়া পালাইয়া গেল; সুশীলা সভয়ে চক্ষু চাহিল। কিন্তু যাহা দেখিল, তাহাতে মৃতের মতই সে সাদা হইয়া গেল। সেই বিদ্যুৎ-রেখায় বিদ্যুৎ-অক্ষরে লেখা রহিয়াছে, তাহার মুক্তি তাহার স্বামীর মৃত্যুতে!

সুশীলা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল; দুই হাতে বুকটা চাপিয়া ধরিয়া মনে মনে কাতর কণ্ঠে অদেখা অজানা ভগবানের কাছে বার বার প্রার্থনা করিল, এ চিন্তা যেন আর না তাহার মনের কোণেও জাগে।

বাগান হইতে ফুলের গন্ধ বাতাসের পিঠে চড়িয়া ভাসিয়া আসিতেছিল, গোটা কত পাখী মধুর স্বরে গান গাহিতেছিল, গোটা দুই প্রজাপতি বিচিত্র বর্ণের পাখা উড়াইয়া জানালার সামনেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, সুশীলা মূঢ়ের মত তাহাই দেখিতে লাগিল।

কি মধুর সেই গন্ধ। কি মিষ্ট পাখীর কলতান। কি অপার্থিব সুন্দর ঐ প্রজাপতি দু'টি! সে গন্ধকে বাধা দিবার কেহ নাই, সে গান থামাইতে কাহার ক্ষমতা নাই, ঐ সুন্দর জীবদু'টার সৌন্দর্য্য নষ্ট করিবার মত প্রাণ কাহার নাই—কি সুন্দর!

ফুল গন্ধ বিলাইতে ভালবাসে; ভালবাসা তাহার সম্পূর্ণ; পাখী গান গাহিয়া তৃপ্তি পায়—পরিপূর্ণ তৃপ্তির সুধাপাত্র টলটল করিতেছে; সুন্দর সৌন্দর্য্য বিলাইয়া সুখী, স্বাধীন ভাবে সৌন্দর্য্য ছড়াইতেছে।

প্রেম, তৃপ্তি, স্বাধীনতা—আছে বন-ফুলের, আছে ক্ষুদ্র বিহগের; আছে প্রজাপতির; নাই কেবল তাহারই। এ বিশ্বে একা সেই ভালবাসিতে পারিবে না, ভালবাসা পাইবে না; বিহগ তৃপ্তির ভারে সুধাকণ্ঠ, সেই কেবল অতৃপ্ত; তাহার সৌন্দর্য্য—নিষ্প্রয়োজন, কোন কাজেই লাগিবে না।

"মা !"

কদম ঘরে ঢুকিয়া বলিল—মা বাবু বাগানে বেড়াচ্ছেন ; জিজ্ঞাসা করতে বল্লেন, তুমি কি যাবে ?

বাবু ! তাহার স্বামী !...

—তিনি কোথায় ?

বাগানে।

আমাকে ডাক্‌ছেন ?

হ্যাঁ-মা।

যাচ্ছি।

সুশীলা কর্ত্তব্য বাছিয়া লইয়াছিল।

কাপড় বদলাবে কি ?

সুশীলা একবার স্বীয় দেহের পানে চাহিয়া লইয়া উদাসভাবে বলিল —কি দরকার ! চল, অমনিই যাই।

কিন্তু কদম তাহাতে রাজী হইল না। মাগো ! এমন সুন্দর সে, এই রকম সাজে তাহার বাহির হওয়া কি উচিৎ। তবে অভাগিনী কদমের অন্তর দেশটা আর-এক অভাগিনীর হৃদয়ের রুদ্ধ-বেদনার ব্যথা অনুভব করিয়াছিল, জোর করিয়া নিরর্থক বেশ-বাসের পরিপাট্য সাধিতে বলিতেও প্রবৃত্তি হইতেছিল না। তবে—সে নাকি এই কার্য্যের জন্যই নিযুক্ত, অবহেলা ও ত করিতে পারে না।

বলিল—কাপড় না বদলাও, চুলটা একটু ফিরিয়ে নাও মা।...

সুশীলা আর্শির পানে চাহিতে গিয়া ভয় পাইয়া ফিরিল—মুখের সেই কালী কি গিয়েছে ?

কদম বলিল—আর মুখ-টা...

সুশীলার বুক কাঁপিয়া উঠিল।

মুখটায় একটু সাবান দিয়ে ধুয়ে মুছে নাও।

সুশীলা বুঝিল, কালী যায় নাই ; তাহার বুক টনটন করিয়া উঠিল ; কোনদিকে না চাহিয়া, নিঃশব্দে স্নান কক্ষে প্রবেশ করিল।

মুখ ধুইতে গিয়া কাঁদিল। কি প্রয়োজনে প্রসাধন ভাবিয়া কাঁদিল : তারপর মনে হইল, কর্ত্তব্য ! তাঁহাকে সুখী করাই তাহার কর্ত্তব্য !

কদম চুলে অল্প একটু তেল দিয়া, সযত্নে আঁচড়াইয়া দিয়া, কপালে সিন্দুর চিহ্ন উজ্জল করিয়া দিল।

"এস মা।"

—চল।

সুশীলা অতি কষ্টে পা দু'টাকে টানিতে টানিতে নীচে লইয়া গেল। দ্বিতলে কেহ ছিল না, ততটা কষ্ট হয় নাই কিন্তু একতলে নামিতেই চাকর-বাকরদের দেখিয়া মনে মনে সে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। এ ভাবনাটা তাহার সকালের মূর্চ্ছা ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যে বিভীষিকা ছড়াইতেছিল—কি করিয়া সে এ মুখ সে চাকর-বাকরদের সম্মুখে বাহির করিবে ! মূর্চ্ছার কারণ যদি তাহারা জানিয়া থাকে, আবিষ্কার করিয়া থাকে—কি লজ্জা, ছিঃ—কি লজ্জা !

ইচ্ছা হইল, এখন ফিরিয়া যায় ; সন্ধ্যার অন্ধকারে বাহির হইবে কিন্তু ততদূর আসিয়া ফিরিয়া যাওয়াও ত সহজ নয়, সুশীলা অশক্ত পা দুখানাকে খুব জোরে টানিয়া লইয়া চলিল।

—ঐ যে—বাবু নিজেই আসচেন !—

কদম পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল।

নিকুঞ্জ আসিয়া সুশীলার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন—শুয়ে ছিলে সুশীলা ?

না।

ঘুমোও নি ?

না।

কেন ? আমি যে তোমাকে বলে এলুম...

কথাটা সুশীলা শেষ করিতে দিতে পারিল না, বলিল—ঘুম আসে নি।

নিকুঞ্জ সহজভাবেই বলিলেন—আমি জানতুম, তুমি ঘুমোচ্ছ, তাই ডাকি নি। ঘুমোও নি জানলে ত তোমায় নিয়ে বেরোতুম। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে কিম্বা ঝু দেখিয়ে আনতুম !

সুশীলা কথা বলিল না।

চলিতে চলিতে তাঁহারা ফোয়ারাটার ধারে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। একটা প্রকাণ্ড সাদা পাথরের চৌবাচ্চা, তাহাতে অনেকগুলি লাল নীল মাছ খেলা করিয়া বেড়াইতেছে; লতাগুল্ম হইতে আহার্য্য বাহির করিতেছে, ফোয়ারার জল ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেইখানেই ছড়াইয়া পড়িতেছে, নিকুঞ্জ দাঁড়াইলেন।

একটু বসবে সুশীলা ?

বস।

নিকুঞ্জ জামার পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া বেদিটা ঝাড়িয়া ফেলিলেন; নিজে বসিয়া, বলিলেন—বস সুশীলা !

সুশীলা দ্বিরুক্তি না করিয়া বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ কাটিল, কেহই কোন কথা কহিল না; সুশীলা দেখিতেছিল নৃত্যশীল জলের ভিতরে ক্ষুদ্র প্রাণীগুলির লীলা চঞ্চল পরিভ্রমণ আর নিকুঞ্জ কি দেখিতে ছিলেন—জানি না !

নিকুঞ্জ ডাকিলেন—সুশীলা !

সুশীলা মুখ তুলিল; কথা বলা তখন তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সুশীলা! সকালের কথা কিছু বলব?

সুশীলা নিজের প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিতেই দৃঢ়তা অবলম্বন করিল।

বলিল—বল।

আমার কথা তুমি বিশ্বাস করবে?

সুশীলা ঘাড় নাড়িল, করিবে।

নিকুঞ্জ দুই মুহূর্ত্ত নীরব রহিলেন, তারপর বলিলেন—সুশীলা, সকালে তুমি যে-সব কথা বলেছ তা কি তোমার মনে আছে?

—আছে।

—শুনে আমার কি মনে হয়েছে, জান?

সুশীলা ঘাড় নাড়িল—না। ক্রমেই তাহার হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া আসিতেছিল।

—সুশীলা, এত সুখ আমি কল্পনাও করতে পারি নি, যা তুমি আমায় দিয়েছ। আমি শ্যামকে তাই বলছিলুম...

সুশীলা সভয়ে জিজ্ঞাসিল—সে-কে?

—এমন কেউ নয়, বন্ধু, সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। তুমি ত তাকে দেখেছ সুশীলা। আমার সঙ্গে সে তোমাদের বাড়ীতেও...

হুঁ।

—মনে পড়েছে, খুব খেয়েছিল -

সুশীলা ঘাড় নাড়িল। সে সব কথা আবার কেন? তখনকার কথা এখন যে দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে হয়।

শ্যামকে সব বল্লুম। সে বল্লে...

তরুণী হৃদয় অজানা শঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

—সে বল্লে, তুমি বড়ই সুশীলা মেয়ে...

—কে বল্লে ?

সুশীলা মন দিয়া কথা শুনিতেছে না, নিকুঞ্জ ইহাতে একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—সেই শ্যাম ! সে ত আমার এখানেই থাকে কি না, ঐ যে বাঁ দিকের ঘরগুলো দেখ্‌ছ, ওরই একটাতে সে থাকে !...

সুশীলা জিজ্ঞাসিল—কি বল্লে ?

—বল্লে, তুমি বড় সুশীলা মেয়ে তাই আমার কাছে থেকে আমার সেবা করতে চেয়েছ, অন্য কোন মেয়ে, বিশেষ করে' সহুরে মেয়ে হলে...

সহুরে মেয়ে বা অন্য মেয়ে হইলে কি করিত, সে ভাবনাটা যেন অত্যন্ত ভীতিপ্রদ, সুশীলা শুনিতে চায় না, বলিল—কিন্তু, তুমি ত তখন বিরক্ত হয়েছিলে।

—বিরক্ত ?

—তোমার মুখে তারই চিহ্ন দেখে আমার মাথা ঘুরে গেছ্‌ল, আমি পড়ে গেছলুম। এখন আমার বেশ মনে হচ্ছে।

—না সুশীলা, বিরক্ত আমি কখনই হই নি। তবে বেশী তর্ক করা, উত্তেজিত হওয়া আমার বারণ কি-না, তাই একটু উত্তেজিত হতেই বুকের সেই বেদানাটা ধরেছিল। তুমিও যেমন আজ কিছু খাও নি, আমিও আজ সারাদিন কিছু খাই নি সুশীলা। বুক চেপে শুয়ে পড়েছিলুম, এই একটু আগে উঠে...

সুশীলা ব্যস্ত হইয়া, স্নেহস্বরে জিজ্ঞাসিল—এখন কেমন আছ ?

—খুব ভাল, সুশীলা।

—দুপুর বেলা খুব কষ্ট হয়েছিল বুঝি ? আমায় কেন ডাক্‌লে না ? আমি ও চুপ করে ঘরে পড়েছিলুম, খবর দিলেই যেতুম !

নিকুঞ্জ মৃদু হাসিয়া বলিলেন—তুমি এলেই ত বেদনা যেত না

সুশীলা! তোমার হাতে ত ধন্বন্তরীর্ প্রলেপ নেই যে তুমি গায়ে হাত দিলেই আমি সেরে উঠ্‌তুম!

এ-কথায় সুশীলার মনখানি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

নিকুঞ্জ বলিলেন—এ আমার সঙ্গের সাথী, ব্যাধি। নির্জ্জন, অন্ধকার আর নির্ভাবনা—ছাড়া রোগের ওষুধ নেই, ডাক্তারের বাক্সে নেই, 'কবি-রাজের ঝুলিতে নেই। চুপ করে পড়ে থাকা আর বিশ্রাম!

সুশীলা কুণ্ঠিতস্বরে বলিল—সেই সব কথা কয়েই তোমার অসুখ হয়েছিল আমি বুঝতে পারছি। ও কথা আর নয়—কোন দিন নয়, ভুলেও নয়, কক্ষনো ও নয়—কেমন?

নিকুঞ্জ নীরব-দৃষ্টিতে স্নেহে-উজ্জ্বল মুখখানি দেখিতে লাগিলেন।

—তা হলে আর হবে না ত, কি বল?

—তাই ত মনে হয় সুশীলা। ডাক্তারেরা তাই বলে।

—কি বলে?

—বলে, বিশ্রাম। উত্তেজনা নয়! তবে সারবেই-যে এ কথা কেউই জোর করে বল্‌তে পারে না। দো-ভাবা কথা কয়। সারতেও পারে, না'ও পারে!

সুশীলা তাড়াতাড়ি বলিল—না, না, সারবে বৈ-কি! শান্তভাবে থাকলেই সারবে!

—সে ত তোমারই হাত সুশীলামণি আমার!

সুশীলার কান্না পাইতেছিল। এ আদরের ডাক আবার কেন? যাহা নাই, যাহা গিয়াছে, আবার কেন স্মৃতি তার উজ্জ্বল করিয়া দেওয়া! যে দীপটি নিবাইতেই সে চায়, তাহার সলিতা উস্কান আর কেন!

নিকুঞ্জ সুশীলার একখানি হাত তুলিয়া লইয়া গদগদ কণ্ঠে কহিলেন—তোমার হাত সুশীলা! পুরুষ পারে না, কোন কাজই সে পারে না—

নারী যদি তাকে না সাহায্য করে! আমিও পারব না। সুশীলা, তুমি যদি না আমায় সাহায্য কর। সুশীলা, আমার জীবন-মরণ আজ থেকে তোমার ভার। ইচ্ছা হয় রেখো, না হয়...আমি একটি কথাও বলব না!

সুশীলার মুখখানি গাঢ়-গম্ভীরতায় ভরিয়া উঠিল।

—ও কথা বল না। তুমি যেমনটি চেয়েছ, আমি ঠিক তেমনটিই করব। তুমি ভেব না, তোমাকে আমি এতটুকু বিরক্তও করব না।

বলিতে বলিতে সুশীলা চক্ষু নত করিয়া লইল। কণ্ঠস্বর তাহার মৃদু হইয়া আসিল। নিকুঞ্জ এ-সময়ে নারীর মুখের, দেহের যে শোভা দেখিলেন, জীবনে আর কখন দেখিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না: এ-যেন দিবসকে বিদায় দিয়া সন্ধ্যার আগমন, সমুদ্রের নীল জলের উপর শারদ-মেঘের প্রতিবিম্ব—সুন্দর, গম্ভীর! তাহার মুক্ত কালো চুলে অর্দ্ধেক মুখখানি ঢাকা পড়িয়াছে। তাহার লুণ্ঠিত শাড়ীখানির পাড় হইতে মাথার মধ্যস্থলে যেটুকু কাপড় বাতাসে ঈষৎ দুলিতেছে, সব সুন্দর! সৌন্দর্য্য-নদী যেন জোয়ারে ভরিয়াছে।

নিকুঞ্জ বলিলেন—সুশীলা, পারবে সুশীলা, পারবে—তাহ'লে আজ থেকে মায়ের স্নেহ, ভগ্নীর সেবা, কন্যার...

সুশীলা বলিল—কিসের শব্দ ও!

—কেউ আসছে কি? না, না—ময়ূরটা!

সুশীলা মুগ্ধ দৃষ্টিতে ময়ূরটাকে দেখিতে লাগিল।

—সুশীলা?

—কি?

—এইবার বল।

—কি?

—যা বল্লুম, পারবে?

—পারবো।

নিকুঞ্জ পুলক-গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—ঠিক ? পারবে ? মায়ের মত ..

—পারবো। পারবো !

সুশীলার মন বলিতেছিল, ভালবাসা ত মায়েরই সম্পত্তি, নারী ভালবাসে, ভালবাসার পুরস্কার তাহার মাতৃত্ব! মাতৃত্ব যে নারীর হৃদয়ে সর্বদাই জাগিয়া আছে! নারী যে কেবল 'মা' হইতেই চায়! তাহার ভালবাসা ত মাতৃত্বেরই সূচনা! নিশ্চয়ই পারিবে! তাহার নারী-হৃদয়ের সুপ্ত ভালবাসা মাতৃত্ব পাইলেই পূর্ণ হইবে, ধন্য হইবে, সার্থক হইবে! সে কন্যা হইতে চায় না, পারিবে-ও না; পিছনে ফিরিবার শক্তি তাহার নাই কিন্তু আগে চলিতে সে খুব পারিবে! স্ত্রীর ভালবাসা মায়ের ভালবাসায় পরিণত করিবে। ভালবাসা দুই-ই ; স্ত্রীর ভালবাসা—বাসিতে হয়, পাইতে হয়, মা'র ভালবাসা চির-পাওয়া, চির-দিনের স্বাভাবিক। মা'র ভালবাসায় খাদ নাই, কৃত্রিমতা নাই। স্ত্রীর ভালবাসাই ত কালে মা'য়ের স্নেহ হয়। সে পারিবে।

নিকুঞ্জ কম্পিত হস্তখানি বাড়াইয়া দিয়া, সুশীলার হাত ধরিয়া কোমল-কণ্ঠে ডাকিলেন—সুশীলা!

—পারবো। পারবো।

সুশীলা হাঁপাইতেছিল। নিকুঞ্জ তাহার মুখের অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবিতেছিলেন—এ কি সেই সুশীলা। যাহার জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠার অবধি ছিল না; যাহার ভাবনায় তিনি এই দুইটা দিন মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন!

নিকুঞ্জের হৃদয় ভরিয়া গিয়াছিল। সুশীলার নাম রাখা সার্থক ; সুশীলার সৌন্দর্য্য সার্থক ; হিন্দুর ঘরে, ব্রাহ্মণের ঘরে তাহার জন্ম সার্থক।

—তোমার সেবা করেই আমি সুখে থাকবো। আর কিছুই আমি চাই নে।

—সুশীলা।

—তুমি বুঝি ভাবছ, আমি সকালে সেই কথাগুলো বলেছি ব'লে'—পারব না ?...

—ছিঃ সুশীলা ! তোমার কথায় সন্দেহ করব আমি !

সুশীলা নীরব, নতনেত্র।

—না, সুশীলা, সন্দেহ আমি এক তিল করি নি ; আর তোমাকে ও যদি সন্দেহ করব, তবে ত মরণই আমার ভাল সুশীলামণি...

—একটা কথা রাখ, তুমি শুধু সুশীলাই বলো।

—কেন সুশীলামণি ?

—না, লক্ষীটি, ও নামে নয়। ও আমার ছেলেবেলাকার নাম, ও নামে ডেক না আমায়। আমার ভাল লাগে না।

—কিন্তু সুশীলা, আমার যে ও নাম ছাড়া আর ডাকতেও ভাল লাগ্‌ছে না।

—না। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, না। বল, সুশীলা নাম বদলে ফেলে আর একটা নাম করি।

—সে কি ? নাম বদলাবে কেন ?

—সুশীলা ছাড়া আর একটি কথাও তুমি বলতে পাবে না।

—পাবো না ?

সুশীলা কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—পাবে না নয়, বলো না, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, বলো না। আমার কষ্ট হয়, প্রাণ ফেটে যায়, আমি আমাকে সামলাতে পারি না, বলো না। ভাল হবে না—দুর্বলা নারী আমি, আমায় লোভ দেখিয়ো না, তোমার পায়ে ধরছি আমি।

বলিতে বলিতে সুশীলা মঞ্চ হইতে নামিয়া পড়িয়া নিকুঞ্জের পায়ের তলায় বসিয়া পা চাপিয়া ধরিল।

নিকুঞ্জ তাহাকে তুলিয়া, পার্শ্বে বসাইলেন।

সুশীলা সে স্পর্শে কাঁপিল, অন্তর তাহার কাঁদিয়া উঠিল। দুই হাতে প্রস্তর ফলকটাকে চাপিয়া ধরিয়া আত্ম সম্বরণ করিল।

—সুশীলা বলতে পার জীবন সুখের না মৃত্যু সুখের?

সুশীলা এ-রকম প্রশ্ন কখনও শুনে নাই; ইহার উত্তর কি হইবে. তাহাও জানিত না, নীরবে বসিয়া রহিল।

নিকুঞ্জ পুনশ্চ কহিলেন—বল না সুশীলা?

—কি?

—ভালবেসে যদি মৃত্যু হয় সে সুখের, না সে সুখে বঞ্চিত হয়ে জীবন ধারণ সুখের? কোন্‌টা সুখের?

—আমি জানি-না।—স্বর অশ্রু ছল ছল।

—আমি কিন্তু জানি সুশীলা।

উদ্বেগপূর্ণ মুখে চাহিয়া জড়িতকণ্ঠে সুশীলা জিজ্ঞাসিল—কি?

—ভালবাসে মরণ—সেই সুখের।

না গো না। তা নয়!—বলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অশ্রু-গোপন করিয়া সুশীলা ঊর্দ্ধশ্বাসে স্থান পরিত্যাগ করিল।

কয়েকঘণ্টা পরের কথা, সেই রাত্রি।

সাড়ে আটটার সময় কদম সুশীলার শয়ন-কক্ষের দ্বারে. দাঁড়াইয়া ডাকিল—মা! বাবু যে তোমার জন্যে বসে আছেন মা।

বসে আছেন, শুনিয়াই সুশীলার ধমনীতে রক্ত চন্ গন্ করিয়া উঠিল:

—কেন কদম?

—খাবার দেওয়া হয়েছে মা।

খাবার। মানুষের উপর মানুষের এ কি অত্যাচার। খাইতে ইচ্ছা নাই, রুচি নাই—তবুও খাইতে হইবে! খাওয়াটা কি এমন হেলা—

ফেলা অশ্রদ্ধার জিনিষ যে ইচ্ছাতেও করিতে হইবে, আমার অনিচ্ছাতেও করিতে হইবে,—কেন ?

কদম সাড়া না পাইয়া আবার ডাকিল—মা।

—আমি খাব না কদম। তোমায় ত সন্ধ্যেবেলাই বলে' দিইছি আবার কেন ডাকাডাকি করছ ?

কদম দ্বারটি ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল—ডাকাডাকি আমি কেন করব মা, বাবু ডাকছেন। লুচির থালা সামনে নিয়ে বসে আছেন।

—তাঁকে খেতে বল গে কদম।

—তা কি তিনি খাবেন, মা ?

সুশীলা সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

—তুমি না গেলে, তিনি ত খাবেন না।

—কেন ?

কদম একমুহূর্ত্ত থামিয়া আস্তে আস্তে বলিল—কেন, তা কি তুমি আমার চেয়ে কম জান মা ?

গাঢ় অমানিশায় নক্ষত্রালোকিত আকাশ যেমন উজ্জ্বল, গাঢ় দুঃখের মধ্যেও একটা সুখের চিন্তা সুশীলার মনখানিকে তেমনই প্রফুল্ল করিয়া দিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য! সুশীলা ত জানে, তেমন আহ্বানের কোন কারণই নাই; তাই সে কদমের ইঙ্গিতটিকে সহজমনে লইতে পারিল না।

বলিল—আমি ত কিছুই জানি-নে কদম!

কদম তাহার মুখের পরে দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিল—জান বৈ কি মা!

—না কদম! সত্যি বলছি...

কদম সহরের মেয়ে; ভাগ্য বৈগুণ্যে পরের গৃহে আজ সে দাসী

কিন্তু ছিল একদিন যখন...যাক; দিব্যি গালাটা সে পছন্দ করিত না।

বলিল—সত্যি জান না মা?

—সত্যি কদম।

কদম চুপ করিয়া রহিল। অতি মাত্রায় বিস্মিত হইলেও কথাটা বলা সঙ্গত হইবে কি না ইহাই সে চিন্তা করিতেছিল। অধিকন্তু সুশীলা তাহা জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করে নাই, কাজেই কথা না বলিয়া সে চুপই করিয়া গেল।

সুশীলা কথাটা শুনিবার জন্য সাগ্রহে কাণ পাতিয়া রহিল। কি সে কারণ, যাহার জন্য তাহাকে কাছে না পাইলে তিনি খাইতেও পারিতেছেন না? সন্ধ্যাকালেই ত সে লোক দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছে, তাহার শরীর ভাল নাই, তবু কি সে গুরুতর কারণ, যাহার জন্য সে কথার পরও তিনি তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন? এতদিন ত একেলাই খাইয়াছিলো; একটা দিন, তাহার শরীর খারাপ—তবুও তিনি তাহাকে কাছে না লইয়া আহার করিতে পারিতেছেন না! এমন কি কারণ? ' সে যতদূর জানে, কোন কারণই ত নাই!

সুশীলা কদমের মুখের পানে চাহিতে পারিতেছিল না। কি কথা সে যে বলিয়া ধসে তাহারই ভয়ে সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল তবুও কদম কিছুই বলিল না দেখিয়া, সুশীলা আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না।

বলিয়া উঠিল—কৈ বল্লে না কদম?

—থাক্ মা। ওসব কথা কি আর আমাদের মত লোকের মুখে শোভা পায়।

এ কথায় সুশীলার ভয় আরো বাড়িয়া গেল। এমন কি কথা সে—

সে কদম বলিতে সাহস পাইতেছে না। কিন্তু ভয়ের চেয়ে আগ্রহ বেশী ভারি হইয়া পড়িল।

বলিল—তুমি বল কদম।

কদম হাসি হাসি মুখে বলিল—কিছু মনে করবে না ত বাছা?

তাহার মুখের 'বাছা' কথাটি সুশীলার কাণে খুবই মিষ্ট শুনাইল; তাহাকে আত্মীয় জ্ঞান করিতেই প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জাগিল। সুশীলা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া, হাত বাড়াইয়া কদমের হাত ধরিয়া পাশে বসাইয়া দিল।

ভয়-জড়িত ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল—বল কদম।

—এ যে পুতুল খেলা মা।

—তুমি ভাল করে খুলে বল কদম; আমি বুঝতে পারছি না।

কদম একটুখানি ইতস্তত করিয়া বলিল—রাগ কর' না মা...

—না, না, কদম না, কিছু করব না, তুমি বল।

—বুড়ো ত পুতুল খেলা করতেই এ বয়সে...

সুশীলা কদমের হাত ছাড়িয়া দিল।

কদম ভয় পাইয়া বলিল—রাগ করলে মা?

—না।

কদম একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—চল মা।

—কদম।

তাহার চোখ দু'টা জ্বলিতেছিল; কণ্ঠ হইতে অগ্নি ছুটিতেছিল, কদম থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

—মা।

—বল গে যাও, আমি যাব না।

কদম বিনাবাক্য-ব্যয়ে ঘর ছাড়িয়া যাইতেছিল, সুশীলা তাহাকে ডাকিল—দাঁড়াও কদম।

কোন্ ঘরে ?

—খাবার ঘরে।

সুশীলার প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়িয়া গিয়াছিল।

—চল কদম, যাচ্ছি।

সুশীলা বেশ বাস গুছাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। সেই মুকুরে নিজের ছায়া দেখিয়া একমুহূর্ত্ত কি ভাবিল, তারপর বলিল—চল।

কদম আগে, সুশীলা পিছে, নীচে নামিতেছিল, সিধু লাফাইয়া লাফাইয়া উপরে উঠিতে উঠিতে কদমকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—এত দেরী করে গা! বল্লুম বাবু বসে আছেন...

সুশীলার আর্ত্ত নয়নের দিকে চক্ষু পড়িতেই সিধু স্তব্ধ হইয়া সিঁড়ির গায়ে গা মিশাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

স্বর পরিবর্ত্তন করিয়া বলিল—মা কি একটু ঝোলও খাবেন না গা?

কেহই কোন উত্তর দিল না; নিঃশব্দ পদসঞ্চারে নামিয়া গেল।

—ঐ যে, বাবু দাঁড়িয়ে আছেন,—বলিয়া কদম সেইখানে দাঁড়াইয়া পড়িল।

—এস সুশীলা!

সুশীলা ঘরে ঢুকিয়া চেয়ারখানায় বসিল; ঠাকুর নিঃশব্দে আসিয়া তুই থালা গরম ফুলকো লুচি টেবিলের উপর রাখিয়া দিল; অনেকগুলি তরকারীর বাটী পূর্ব্ব হইতেই সেখানে গোল করিয়া সাজানো ছিল।

—খাও সুশীলা।

সুশীলা 'না' বলিল না; 'না' বলিলেই অনেক কথা আসিয়া পড়িবে, হয়ত তর্কও করিতে হইবে, অপ্রিয় প্রসঙ্গ সমূহও উঠিয়া পড়িতে পারে, সুশীলা ফিঙ্গার-বৌলে হাতটা ডুবাইয়া, লুচির ফোস্কা ভাঙ্গিতে লাগিল।

উভয়েই নীরব।

উভয়েই স্বল্পাহারী—একজন বরাবর অতি অল্প আহার করিয়া থাকেন, অন্যজন আজ ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে আহার করিতে বসিয়াছিল।

ঢক্ ঢক্ করিয়া এক গ্লাস জল খাইয়া সুশীলা দাঁড়াইয়া উঠিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—বড্ড ঘুম পেয়েছে আমার, চোখ খুলতে পাচ্ছি না আমি। বল ত শুতে...

নিকুঞ্জ সুশীলার পিঠে মৃদু করাঘাত করিয়া কহিলেন—রাত হয়ে গেছে—ছেলেমানুষ। যাও, যাও—না, না—যাও না, এসো, এসো।

আবার 'ছেলেমানুষ।' কিন্তু এখন আর সুশীলা রাগিল না। মনে মনে দেবতার পায়ে সেই প্রার্থনাই জানাইল, তিনি যেন তাহাকে আজ হইতে ছেলেমানুষই করিয়া দেন।

'যাও' এবং 'এসোর' মধ্যে যে প্রভেদ ও যে পার্থক্য আজ তাহা বুঝিবার মত অবস্থা সুশীলার মনের ছিল না। ধীরপদে সে চলিতে আরম্ভ করিল।

নিকুঞ্জ সঙ্গে সঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া বলিলেন—সকাল সকাল শুচ্ছ, সকালেই ঘুম ভাঙবে বোধ হয়।

সুশীলা ঘাড় নাড়িল। কথা কহিবার শক্তি তাহার ছিল না। কক্ষের বাহিরে আসিয়া একবার চারিদিকটা দেখিয়া লইয়া শ্রান্তিনত হৃদয়ে দ্বিতলে উঠিয়া গেল।

কদম শয়নকক্ষের গালিচায় দেহ বিস্তার করিয়া পড়িয়াছিল, সুশীলা ঘরে ঢুকিতেই উঠিয়া পড়িল।

স্নেহমধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসিল—কিছু খেলে না?

—খেইছি।

—বেশ করেছ। যে বুড়ো রাত্তির—ছেলেমানুষ।

ছেলেমানুষ! এবার কথাটা যেন চাবুক হইয়া সপাং করিয়া সুশীলার

পিঠের উপর আছড়াইয়া পড়িল। ব্যথায়, বেদনায় দেহটা যেন জ্বলিয়া উঠিল।

কদম পুনশ্চ কহিল—শোবে ত মা? জামা-টামাগুলো খুলে দিই?

—দাও।

সে একখানা আরাম কেদারায় অর্দ্ধশায়িত ভাবে বসিয়া পড়িল। কাল সে কদমকে তাহার গায়ে হাত দিতেও দেয় নাই, বাধা দিয়াছিল, আজ কোন বাধার কথাই মনে হইল না। বরং আজ যেন কেহ খুলিয়া না দিলে জামা-জোড়া তাহার খোলাই হইত না।

সত্যই সুশীলার বড় ঘুম পাইয়াছিল। এত ঘুম আসিয়া তাহার চোখ দু'টিকে, মনখানিকে অবশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে ভিতর দিক হইতে দ্বারটি বন্ধ করিতে গিয়া দুইবার দুইটা চৌকীতে ওঁচোট লাগিয়া সুশীলা পড়িয়াই গিয়াছিল। অন্ধ-নেত্রে সুইচ্ বোর্ডটা ত খুঁজিয়াই পাইল না; তিনটা তিনশ' বাতীর আলো ঘরখানাকে আলো করিয়া সুশীলার সুপ্তিমগ্ন দেহটির পরে ঘুমাইয়া রহিল।

রাত্রি তখন একটা!

চড়াক্ করিয়া সুশীলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষু চাহিয়া সুশীলা দেখিল আলোগুলা যেন লক্ষগুণ জোরে জ্বলিতেছে; সুশীলা ঘরময় দৃষ্টি ফিরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই যেন ঠিক মত দেখিতে পাইল না; যেন সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে।

ঠক!

ও কিসের শব্দ?

দরজায় না?—না, না—এত রাত্রে দরজায় ঘা পড়িবে কেন? নিশ্চয়ই অন্য কোথাও—তাহার ঘরের দ্বারে নয়।

না। এ যে তাহারই কক্ষ দ্বারে, অতি মৃদু করে কে আঘাত করিতেছে!

সুশীলার মনে পড়িল, এই শব্দই তাহাকে জাগাইয়া দিয়াছে। ঠিক হইয়াছে। এই-ই বটে! সুশীলা উঠিয়া বসিল। কাণ খাড়া করিল।

কোন সন্দেহ নাই! তাহারই মন্দির দ্বারে অনাহূত পথিককে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে? নগুদা কি? না, না, নগুদা নয়! নগুদা এখানে এত রাত্রে কিরূপে আসিবে! কিরূপে আসিবে জানে না, তবে নিদ্রাভঙ্গে এই শব্দে সুশীলার কেমন ধারণা হইয়াছিল, তাহার আবাল্যের বন্ধু নগুদাই তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে। দ্বার খুলিলেই সে দেখিবে, সেই বিরাট স্কন্ধ, দীর্ঘ দেহ, বড় বড় চুলে ঢাকা মুখে নগুদা একটা মস্ত লাঠি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অবশ্য এ বিশ্বাসের কোন যুক্তিযুক্ত কারণ সে নিজের মনেও খুঁজিয়া পাইল না।

ঐ ত! এখনো! বড় মৃদু, বড় করুণ সে এ আঘাত! এ ত নগুদা'র নয়!

কে? কে? কোন দেবতা কি? তাহার দুঃখের কথা শুনিয়া আসিয়াছেন।

তবে নিশ্চয়ই তিনি! তাহার স্বামী! সে একলা আছে, তাই তিনি সব তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছেন!

বিদ্যুৎ চালিতের মত সুশীলা শয্যা ছাড়িয়া উঠিল। ধীরপদে আসিয়া দুয়ারে মাথা রাখিয়া কম্পিত বক্ষে দাঁড়াইল।

শব্দ বর্দ্ধিত হইতেছিল আর সে শব্দে নারী বৈশাখী ঝড়ে জেলে ডিঙ্গিখানার মতই দোল খাইতেছিল।

—সুশীলা!

দেবতা নয়!

নগুদা নয় কিন্তু সুশীলা তাহাতেও ক্ষুণ্ণ হইল না। গভীর রাত্রে সুখ-স্বপ্নের মত, আবেশের মত নিজের নামটা অতি মধুর, অতি মিষ্ট, অতি স্নিগ্ধ, অতি মর্ম্মস্পর্শী হইয়া তাহার কাণে পশিল। কিছুক্ষণের জন্য নারী চৈতন্য হারাইল।

উত্তর নাই, সাড়া নাই, শব্দ নাই। নীরব, নিশ্চল, দেহে সুশীলা কপাটের গায়ে মাথা রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আবার! আবার! সেই ধীর, মৃদু, মধুর করাঘাত!

সঙ্গে সঙ্গেই—সুশীলা!

সুশীলার লুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার নারীত্ব, প্রেম, কামনা, বাসনা—সব এক সঙ্গে এক তারে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। দ্বারটাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া শতখান করিয়া, ছুটিয়া বাহির হইতে ইচ্ছা হইল। প্রেম-পল্লবিত দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিবার আকুল পিপাসায় নারীকণ্ঠ ফাটিয়া মরিতেছিল; বুকে বুক, মুখে মুখ, নয়নে নয়ন, হৃদয়ে হৃদয় ধরিবার আকুল-আশায় অধীর হইয়া উঠিতেছিল আর সেই সঙ্গে নারীর দেবীত্ব, নারীর ত্যাগ, নারীর সহন-শক্তি, নারীর মহত্বও সে হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। সে কি দ্বন্দ্ব!

সে দ্বন্দ্বে নারী ক্ষত বিক্ষত হইল; শতধারে তাহার রক্ত ছুটিয়া গেল শেষ মহত্বই জয়ী হইল। সেই যে প্রেমের নামোচ্চারণ করিবে না শপথ করিয়াছিল; সেই যে সতত তাহাকে রক্ষা করিবে অভয় দিয়াছিল, নিজের সুখ তৃপ্তি সব স্বামীর জীবনতলে বলি দিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সেই যে জীবন পণ করিয়া জীবন সঙ্গিনী হইবে বলিয়াছিল—সব কথা সুশীলার মনে পড়িয়া গেল। ক্ষুদ্র, তুচ্ছ সুখ দুঃখে গড়া নারী একমুহূর্ত্তে নারীর অন্যরূপ ধারণ করিল। সে রূপ জ্যোতিতে স্বার্থের ছায়া নাই; আত্ম-সুখের গন্ধ নাই, সে রূপ ত্যাগের বর্ণে উজ্জল, সংযম-স্বর্ণে মূল্যবান।

—সুশীলা, দোর খোল সুশীলা, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি আমি, দোড়টা খুলে দাও সুশীলা। তোমার কাছে আমি এইছি সুশীলা!

সুশীলা শুনিল। শুনিল না শুধু—কাণ দিয়া; বুক দিয়া শুনিল, হৃদয় দিয়া শুনিল, রন্ধ্রে রন্ধ্রে শুনিল। প্রত্যেকটি শব্দে অসম্বদ্ধ হৃদয় আলোড়িত করিয়া, কাঁপাইয়া নাচাইয়া মাতাইয়া পাগলের মত বাহির হইয়া আসিতেছিল।

দ্বন্দ্ব তখন নিবৃত্ত হয় নাই; তখনও সে দ্বন্দ্ব সুশীলাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিতেছিল। তিনি আসিয়াছেন, স্বামী! স্বামী!...কিন্তু সকালের শোনা সেই মর্ম-ভরা কথাগুলা, সন্ধ্যার সেই ফুলবাগানে তাহার সেই দৌবল্য সুশীলা ত ভোলে নাই! সেই প্রেম ও মনের নিকট-সম্বন্ধটা ত সে ভোলে নাই এখনো—কোন্ প্রাণে সে দুয়ার খুলিবে! স্বামী যে! নারীর ইহ-পরকারের দেবতা যে! তাঁহার জন্যই যে তাহাকে দৃঢ় হইতে হইবে, কঠোর হইতে হইবে!

সুশীলা খুলিবে না। তাহাদের মধ্যস্থলে যে কাঞ্চনির্মিত দৃঢ় ব্যবধান আছে থাক্, থাক্, থাক্!

—সুশীলা।

সুশীলার বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পাইল; রক্তশূন্য কম্পিত শ্বেত হস্তখানি তাহার অর্গল স্পর্শ করিল।

—সুশীলা!

সুশীলা কাঁদিয়া ফেলিল।

মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দে বলিল—আবার কেন তুমি এলে! যাও, যাও—রাত হয়েছে, যাও, না—না—দোর খুলতে আমি পারব না, তুমি যাও।

বলিয়াই সে বুকটা চাপিয়া ধরিয়া প্রাণ-ঘাতী বেদনা দমন করিতে চেষ্টা করিল।

—আমি বলছি, প্রিয়তমে !

—না গো না, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি খুলতে বলো না, তুমি যাও।

সুশীলা, কথা শোন—আমি বলছি।

—আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি—বলিতে বলিতে সুশীলার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল।

—খুলবে না ত ?

বেদনাটা এখন আর শুধু বুকে নয়, সুশীলার দেহের ভিতর, শিরার ভিতর হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিল ; সুশীলা কথা কহিতে পারিল না।

সুশীলা !

যত জোর ছিল তাহার দেহে, তাহাই দুই হস্তে একত্রিত করিয়া সে বুকখানা চাপিয়া ধরিয়া সেইখানেই মাটিতে বসিয়া পড়িল।

অতিকষ্টে কহিল—না !

তারপর—বাহিরে পদশব্দ শ্রুত হইল। প্রথমে বারান্দা, তারপর সিঁড়িতে—তারপর শূন্যে মিলাইয়া গেল ; আর কোথাও কোন শব্দ নাই। প্রকৃতি আবার স্তব্ধ হইল।

স্বামী চলিয়া গিয়াছেন ! ! !

এই চিন্তাই তাহাকে উন্মাদ করিয়া দিল, ক্ষিপ্ত করিয়া দিল। ক্ষিপ্তের মত দাঁড়াইয়া উঠিয়া, সুশীলা ঝন্ ঝন্ শব্দে দ্বার খুলিয়া ফেলিল।

অন্ধকার !

মাথাটা বোঁ করিয়া ঘুরিয়া গেল ; পায়ের নীচে ধরিত্রীও টলিয়া গেল ; সুশীলা মূর্ছিতা হইয়া পড়িতেই, দ্বার খোলার শব্দে ছুটিয়া আসিয়া, কদম তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সাথী—ইহ-পরকালের

সন্ধ্যা হয়-হয়।

জিরাট ষ্টেশনে ফিপ্‌টি ওয়ান্ 'আপ' ট্রেণখানি থামিতেই দুইটি স্ত্রীলোক অতি কষ্টে নামিয়া পড়িল। প্ল্যাটফরম না থাকায় বর্ষিয়সী রমণী আগে নামিয়া, অবগুণ্ঠনবতীর হাত ধরিয়া 'নামাইয়া লইল। তাহাদের সঙ্গে কোন মাল-পত্র ছিল না; নামিয়াই তাহারা ফটকের দিকে চলিতে লাগিল।

ষ্টেশনের ছোটবাবু টিকিট আদায় করিতেছিলেন, তাঁহারই কাছে আসিয়া বর্ষিয়সী রমণী জিজ্ঞাসিল—বাবু, হিশানে কি গরুর গাড়ী পাওয়া যায়?

ছোটবাবু অবগুণ্ঠনবতী যুবতীর বস্ত্রাচ্ছাদিত' দেহটির পানে তৃষ্ণার্ত্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—তোমরা কোথা যাবে বাছা?

—পরাণপুর যাব বাবু!

ছোটবাবু দুঃখিতভাবে ঘাড়টি নাড়িয়া বলিলেন—না বাছা, গরুর গাড়ী এখানে পাওয়া যায় না।

এই সময়ে যুবতী তাহার সঙ্গিনীকে কাছে ডাকিয়া কি বলিল; বর্ষিয়সী ছোটবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—আচ্ছা বাবু, গাড়ীতে দরকার নেই, একটা লোক দিন-না আমাদের সাথে একটা লণ্ঠন দিয়ে, পৌঁছে দেবে, আমরা পয়সা দোব।

ছোটবাবু হাসিয়া বলিলেন—এ কি আর সহর বাছা যে পয়সা দোব বল্লেই লোক পাবে। বিশেষ এই রাত্রিকালে?

—রাত্তির নইলে আমরাই বা লোক চাইব কেন বাবু! আমাদের দেশ-ঘর আমরা নিজেরাই ত চিনে যেতে পারতুম।

—তোমাদের বাড়ী?

—বল্লুম যে বাবু, পরাণপুর।

—কোথায় গেছলে?

—আমার মেয়ের শ্বশুরবাড়ী।

—এইটি তোমার মেয়ে বুঝি?

—হ্যাঁ বাবা! একটু দয়া কর না বাবা।

ছোটবাবু দয়া করা যায় কি-না তাহাই ভাবিতে লাগিলেন; পাঁচ মিনিট ধরিয়া ভাবিয়াও দয়া করিবার পথ খুঁজিয়া পাইলেন না; বলিলেন—না বাছা, রাত্রে লোক পাবে না। আর ওদিকের প্যাসেঞ্জার রাত্রের গাড়ীতে ত আসে না, বি-কেলেই যা দু'একজন আসে। পথটাও ত বড় কম নয়, ক্রোশ দুই হবে-কি বল?

বর্ষীয়সী গম্ভীর ও চিন্তাযুক্ত মুখে কহিল—তা হবে বৈ-কি বাছা।

—এক কাজ কর ত হয় বাছা। আজকের রাত্রিটা এইখানে কোথাও কাটিয়ে দাও, সকালে চলে যেয়ো।

—তাই বা কোথায় থাকি বাবু। চেনা শুনো...

—এক হ'তে পারে।

—হতে পারে,—কি বাবা?

—আমার বাড়ীতে যদি তোমরা—হ্যাঁ নেহাৎই থাকা—কথাগুলা অত্যন্ত জড়াইয়া যাইতেছিল—আমার বাসাখানিই পড়ে আছে, থাকতে পারো।

যুবতী তাহার সঙ্গিনীর কাণে কাণে আবার কি বলিল; রমণী বলিলেন—না বাবা, থাকবার আমাদের জো নেই।

—"কোথা গেলে হে নেত্ত ?—"

ছোটবাবুটির নাম নেত্য ; বড় বাবু ডাকিলেন।

"আজ্ঞে যাই।"

—কি করবে বল বাছা, আমি আর দেরী করতে পারি নে।

—না বাবু, আমাদের যেতেই হবে।

একবার সতৃষ্ণ নয়নে সেই পরিপূর্ণাঙ্গী যুবতীটির আপাদ মস্তক দেখিয়া লইয়া ছোটবাবু বিরক্ত ভাবে কহিলেন—যেতে পার যাও, আমার কি !...

তিনি প্রস্থান করিলেন ; বলা বাহুল্য দেহই তাঁহার গেল, মনটি গেল না ; সুন্দরী যুবতীটির আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

যুবতী বলিল—রেলবাবুদের আমার বড্ড ভয় করে বাপু। বাড়ীতে থাকতে কাকাবাবুর খবরের কাগজ আসতো, কত কাণ্ড পড়তুম।

—সে কি আর আমি জানিনে বাছা, ওরা সব করতে পারে। কিন্তু এখন কি করা যাবে মা ? পথ জানা নেই, এই অন্ধকার, বিদেশ...

—বিদেশ নয়...

—তা না হয় না-হল, অচেনা রাস্তা ত।

—তাইত কদম।

পাঠিকা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন ইহারা কদম ও সুশীলা ছাড়া আর কেহই নহে।

মুর্ছাভঙ্গে সুশীলা কদমের পা দুটা চাপিয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, কদম তুমি আমাকে রক্ষা কর। এখান থেকে নিয়ে চল, এখানে থাকলে আমি মরে যাবো। কখনই বাঁচবো না, মরে যাবো।

নিজের বিশ্রী জীবনেতিহাসের যে পাতা ক'টি কাদম্বিণীর মনের চক্ষুতে অহর্নিশ ভাসিয়া বেড়াইত, তাহাতে এ-হেন প্রস্তাবে রাজী

হওয়া কাদম্বিনীর পক্ষে সহজ ছিল না। বৈধব্য-যন্ত্রণা-পীড়িতা নারী মুহূর্তের অবিবেচনায় দুর্ভাগ্যের যে চরম দশায় উপনীত হইয়াছিল তাহা ভাবিতে এ শেষ বয়সেও কাদম্বিনী শিহরিয়া উঠে। তাহার বাল্যের শিক্ষা, কুল-জ্ঞান ছিল তাই রক্ষা, নহিলে আজ যে কি হইত, মনে করিতেও তাহার হাত পা অসাড় হইয়া যায়। কোন শত্রু-রমণীকে ও কদম প্রাণ থাকিতে সে পথে যাইতে দিতে পারে না।

বলিয়াছিল—কোথায় যাবে মা! বাপ-মা যাঁর হাতে দিয়েছেন তাঁকে ছেড়ে কোথায় যাবে মা-আমার?

এই সুখ-স্পর্শ-হীনা মেয়েটাকে কদম নিজের মেয়ের মতই ভাল বাসিয়াছিল, কথা বলে আর কাঁদে।

—তা জানি-নে কদম, যেখানে হোক, নিয়ে চল। এখানে থাকলে আমি বাঁচবো না, আর হয়ত একদিন নিজেই স্বামী হত্যা করে বসব। তোমার পায়ে পড়ি কদম, সে পাপ থেকে আমায় রক্ষা কর। তুমি আমার মা, মায়ের কাজ কর; পাপ থেকে আমায় রক্ষা কর।

সুশীলা, তুমি আমায় মা বলে ডেকেছ; মা হয়ে...

—মা-ইত মেয়েকে রক্ষা করে কদম। কিন্তু আমার সত্যিকারের মা তা করে নি—কে জানে তিনিই আমার মা কি-না; মনে হয়...

—ওকথা বলতেই নেই সুশীলা। মা তোমার ভালর জন্যেই...

দপ করিয়া জ্বলিয়া-ওঠা আগুনের মত সুশীলা বলিয়া উঠিল—ভালোর জন্যেই বটে কদম! পয়সা ধুয়ে খাবো, গাড়ীজুড়ি গলায় বাঁধবো—থাক্‌গে। তাঁর কাজ তিনি করেছেন, তুমি আমাকে উদ্ধার কর, আমাকে স্বামী-হত্যার পাতক থেকে রক্ষে কর।—দোহাই কদম, তোমার পায়ে পড়ি কদম, বাঁচাও। স্বামীকে রক্ষা কর।

—বার বার ওকথা বলছ কেন সুশীলা?

—কেন ! তা জানি-না। তবে জানি আমার ভালবাসার প্রতিদান দিতে গেলেই তিনি মারা যাবেন ; নিজে বলেছেন।

কদম এ-সকল সংবাদ জানিত।

—চুপ করে' রইলে কেন কদম ! আমাকে তুমি বাঁচাবে না ? আমার দুঃখে তোমার দয়া হয় না কদম ! তুমিও ত মেয়ে মানুষ কদম, তোমারও ত স্বামী ছিল কদম ; তুমিও ত তাঁকে ভালবাসতে কদম, তুমিও ত তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করতে না...

এত স্নেহবাক্য কদমের সহিল না ; সে কাঁদিয়া ফেলিল !

—কোথায় যাবে সুশীলা।

সুশীলা উত্তেজিত হইয়া বলিল—যেখানে হোক্ নিয়ে চল ; এখান থেকে আমায় উদ্ধার কর। দু'দুটো প্রাণ বাঁচাও কদম।

—বাপের বাড়ী যাবে ?

—বাপের বাড়ী ?

সুশীলার সেই মা'র কথা মনে পড়িল, যে মা...

—যাব না।

তবে ? বাপের বাড়ী ছাড়া মেয়ে মানুষের যাবার স্থান আর কোথায় আছে সুশীলা ?

—নেই ?

সুশীলার স্বর অত্যন্ত হতাশাপূর্ণ।

—না। আর ভয় পাচ্ছ কেন সুশীলা। যখন যে অবস্থায় যাও, যত কালি মেখেই যাও, মা কি মেয়েকে ফেল্‌তে পারেন ? মা-যে ! মা'র কাছে ছেলে-মেয়ের আবার অপরাধ ! যদিই যেতে চাও, মা'র কাছে চল, রেখে আসি। মা না আশ্রয় দেন—যদি না তা সম্ভব নয়—না দেন...

সুশীলা হতজ্ঞানের মত বলিয়া উঠিল—নগুদা দেবে।

কদম একমুহূর্ত্ত তাহার রক্তশূন্য পাংশু মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—না সুশীলা, মা ছাড়া আর কেউ এমন অবস্থায় মেয়েকে কোলে তুলে নিতে পারে না।

সুশীলা তদগত চিত্তে কহিল—তাই চল।

সে দাঁড়াইয়া উঠিল।

—আজই?

—আজই। এখনই।

—সে কি সুশীলা?

—নইলে কাল সকালেই দেখ্‌বে একজন, দু'জনের একজন বেঁচে নেই! এখনি ত দেখ্‌লে কদম! বার বার আমি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারব, মনে কর? না কদম, তা পারব না। আমি ত নারী, রক্ত মাংসে গড়া মানুষ।—পারব না। পারব না আজই, এই রাত্রি শেষ না হতেই পালাতে হবে। টাকার জন্যে ভেবো না, ঐ বাক্সে অনেক টাকা আছে—চল কদম। আর ভেবো না, যত ভাববে, দেরী হয়ে যাবে।

তাহারা—বাহির হইয়াছিল।

কিন্তু এ-যে হিতে বিপরীত হইয়া গেল! এই রাত্রে, যুবতী স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া কদম একেলা পথ চলেই বা কোন্ সাহসে আর রেল বাবুর কথায় তাঁহার গৃহেই বা যুবতী নারীকে রাখে কি ভরসায়?

একটা লণ্ঠন হাতে একটা হিন্দুস্থানী ডাকিল—এই মায়িলোক, ইধার আও, বাবু বুলাইন্ হ্যায়!

'বাবু' শুনিয়াই সুশীলা কদমকে জড়াইয়া ধরিল।

—ও কদম!

—ও বাপু হিন্দুস্থানী, শোন বাছা!

—আরে ইধার আও-না, তোমলোগ্। ক্যায়সা ঔরৎ হায় তুম লোক! বড়বাবু টিশন মাষ্টার বাবু...

—আমার যে সেই লোকটাকে বড় ভয় করছে কদম।

কদমেরও ভয় হইতেছিল কিন্তু বাহিরে কদম তাহা প্রকাশ করিতে চাহিল না, বলিল—ভয় কিসা!—হিন্দুস্থানীকে বলিল—দেখ বাপু...

"কোন ভয় নেই মা, তোমরা এদিকে এস।"

—সে নয়—কদম! এ অন্য লোক!

—না, চল দেখি।

তিনি বড় মাষ্টার। লোকটির বয়স হইয়াছে, মোটা সোটা কালো কোলো চেহারা; রেলের কোট গায়ে, বোতামগুলা চক্ চক্ করিতেছে, মাথায় ছাপ-আঁটা টুপি; পায়ে কাঠের খড়ম। ষ্টেশনের পিছনের বড় কোয়াটারটিতে স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া বাস করেন।

—তোমরা কোথায় যাবে বল ত মা?

—বাবা, আমরা পারণপুরে যাব।

—এই রাত্রেই যেতে চাও? আমার বাসায় আমার মা, স্ত্রী, মেয়ে ছেলে আছেন, রাত্রিটা যদি ইচ্ছে কর, মা, অক্লেশে থাকতে পার।

—আমাদের যাওয়া দরকার বাবা।

প্রৌঢ় লোকটি হিন্দুস্থানীকে অনেকগুলা কি উপদেশ দিয়া, বলিলেন—বেশ, এই ভরসকে তোমাদের সঙ্গে দিচ্ছি, ও তোমাদের পোঁছে দিয়ে আসবে'খন; গণ্ডা আষ্টেক পয়সা ওকে গাঁজা খেতে দিও।—যা ব্যাটা যা।

—তা দোব বৈ-কি বাবা!

ষ্টেশন মাষ্টার পয়েণ্টস্‌ম্যান রামভরসাকে সারারাত্রির অবকাশ দিয়া বলিলেন—রাতটা ওঁদেরই দাওয়ায় মাওয়ায় থাকিস্ পড়ে,

সকালে ফার্ষ্ট ট্রেণের আগে এসে পৌঁছুলেই হবে। ছোট বাবুকে বলে যাচ্ছি, খেলওয়ানকে দিয়ে রাতটা চালিয়ে নেবে।

এই তিনটি প্রাণী নিঃশব্দে দুই ক্রোশ পথ চলিয়া আসিল। পথে কেহ একটি কথাও বলিল না। ভরস নিদ্রার ঘোরে চলিতেছিল, দু' একবার হুঁচোট খাইয়াও তাহার চৈতন্য হইল না, চক্ষু মুদিয়াই চলিতে লাগিল। কদম ও সুশীলার মনের ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের হইলেও দুইটি হৃদয় চিন্তার ভারে এতই অবসন্ন ছিল যে কথার অবসর ছিল না।

রেল-লাইনের ধারে ধারে উচু নীচু গ্রাম্য মেঠো পথ, ধূলায় ভরা; বর্ষাকালে এই সকল স্থানে বস্ত্র পরিধান করিয়া চলা অসম্ভব। এখন শুষ্ক ধূলা পায়ের হাওয়ায় নাকে মুখে ঢুকিয়া, মাথায় বাসা বাঁধিয়াছে।

এইট্‌-টি-সেভেন আপ্‌ চলিয়া গেল। ভরস বলিল, রাত ন'টা!

বুড়া শিবতলার পাশেই রাম-সীতার মন্দির। কথিত আছে, রামলক্ষ্মণ বনবাস যাইবার কালে সীতাকে লইয়া এই পথ হাঁটিয়াই গিয়াছিলেন, এই মূর্ত্তি তখনকার সময়ের। এ সম্বন্ধে রামায়ণ, ইতিহাস কি বলে আমরা জানি না, রাম-সীতা-বিগ্রহের উত্তরাধিকার-সূত্রে সেবায়েৎ শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ঠাকুর এই ইতি-কথা কহিয়া দু'পয়সার সংস্থান করিয়াছেন। লাট হররামপুর ইজারা লইয়া সুখে ঘর-সংসার করিতেছেন।

ভরস রাম-সীতা মন্দিরের সামনে আসিয়া তাহার আধ-আঁধার আধ-আলোময় লণ্ঠনটি ভূতলে নামাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হইল।

বলিল—মায়িলোক, হিঁয়াপর রামসীতাজী...

সুশীলা ত্রস্তে কহিল—এটা কোন্ গাঁ, গোপালপুর?

—জী! হিঁয়াপর রামজী লক্ষ্মণজী ঔর...

—দাঁড়াও, কদম! আমি আস্‌ছি।

বলিতে বলিতেই সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিল। কদম, ভরস হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

একটা বাড়ী হইতে গোটা দুই আলোর রশ্মি অন্ধকার ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল, সুশীলা সেইদিকেই ছুটিতেছিল, কদম ভরসকে বলিল—চল আমরাও যাই, অন্ধকারে মেয়েটা শেষে কি পড়ে মরবে?

—রাস্তা হ্যায়?

—আছে নিশ্চয়ই। নইলে গেল কেমন করে? চল্।

—চলিয়ে।

পাশা-পাশি দুইটা বাড়ীতেই আলো জলিতেছিল, সুশীলা যে কোন্‌টায় ঢুকিয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া কদম সেইখানে দাঁড়াইয়া পড়িল। আশা, সুশীলা নিশ্চয়ই বাহির হইয়া আসিবে।

ভরস বেদনা-করা কোমরটিকে বিশ্রামসুখ দিতেই বসিয়া পড়িয়া শুখা তৈয়ারীতে মন দিল।

একটা বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া সুশীলা কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল—নণ্ডদা।

নণ্ড প্রদীপ জ্বালিয়া লাঙ্গলের, জলপানের মোটামুটি হিসাবটা করিয়া ফেলিতেছিল, হাত হইতে সেলেট্, পেন্সিল পড়িয়া গেল। বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই, সুশীলা তাহার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া বলিল—তোমার সুশীলা, নণ্ড দা।

সুশীলা! কবে এলি রে?

আজই, এখনই—সোজা ষ্টেশন থেকে, তোমার কাছে এইছি।

—সঙ্গে?

—ঝি আছে।

—সে কি। তুই যে রাজরাণী হইছিলি সুশীলা...

—যে সুশীলা রাজরাণী হয়েছিল—সে সুশীলা মরে গেছে নগু দা।

নগু সাদাসিদে লোক। মাঠে আমারে চাষ করে, পাট বেচে, হেঁয়ালির ধার ধারে না। বলিল—কি হয়েছে বল্ ত রে?

—সত্যি, নগুদা সে সুশীলা মরে গেছে! আমি মরতে বসেছি নগু-দা। তুমি বাঁচাও,ত বাঁচি।

—কি বলছিস্ পাগলের মতন।

সুশীলা উঠিয়া নগুর হাত ধরিয়া বলিল—এস আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে নগুদা, যা বল্‌ব সেখানেই বল্‌বো। তুমিও শুন্‌বে, মা-কাকা এঁরাও শুন্‌বেন।

—কিন্তু...

—আর কিন্তু নয়। এস।—সে নগুর হাত ধরিল।

পরস্ত্রীর হস্তস্পৃষ্ট হইয়া নগু সরিয়া দাঁড়াইল।

—দাঁড়া দাঁড়া।

সুশীলা নগুর হাতটা ত্যাগ করিয়া, বলিল—তুমি কি আমার সেই নগু-দা?

নগেন বলিল—নগু-দা সেই, তবে তুই আর সেই সুশীলা নস্ রে।

—নই?

—কি করে?

—আমি তোমার সেই সুশীলাই আছি নগু-দা। সেই ছেলেবেলাকার সুশীলাই। এস।—আবার হাত ধরিল।

নগু ত্রস্তে হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া দু'পা পিছাইয়া গিয়া বলিল।—

—তুই চ, আমি যাচ্ছি। তোর ঝি কোথায় বল্, ডেকে দিই।

—না, আমার সঙ্গে তোমাকে আস্‌তে হবে।

নগু স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

অভিমানে সুশীলার বুক ভরিয়া উঠিল। এই লোকের ভালবাসার ধ্যানে মগ্ন হইয়া ছিল; বাড়ী ছাড়িয়া অবধি ইহার চিন্তাতেই বিভোর হইয়াছিল। যে তাহার অঙ্গ-স্পর্শ ভয়ে সরিয়া সরিয়া যাইতেছে, তাহার সহিত কথা কহিতেও যাহার অনিচ্ছা ফুটিয়া উঠিতেছে! অদৃষ্টে এতও ছিল? সুশীলা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—আসবে না?

নগু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—না।

সুশীলার যেন বিশ্বাস হইল না, আবার বলিল—আসবে না?

না। যতক্ষণ না জানতে পারছি, তুমি কোন অন্যায় ক'রে আস-নি, ততক্ষণ নয়। বল,—অন্যায় ক'রে আস-নি?

না।

সত্যি বলছ সুশীলা?

সুশীলা অশ্রু সজল-নেত্রে, গদগদ কণ্ঠে কহিল—এই তোমার হাতে হাত রেখে বলছি।—সে হাত ধরিল।

নগু সে হাত আর ছাড়াইল না; আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিল চল।

দ্বারে শিকলটি দিয়া বলিল—ও বাড়ীতে বাবা, মা আছেন, দেখা করবি না কি-রে?

না। এখন না।

সে হাঁপাইতেছিল।

নগু বিস্মিত হইয়া বলিল—অমন করছিস কেন সুশীলা?

ও কিছু না। নগুদা, তুমি আমায় ভালবাস?

এ কথা আজ কেন সুশীলা?

শুন্‌তে ইচ্ছে হয়েছে। বল না নগুদা? বাস?

বাসতুম বৈ-কি সুশীলা! আর সে কি তুই-ই জান্‌তিস্‌ নে সুশীলা? কিন্তু আর কাউকে ভালবাসব না। বড় কষ্ট সুশীলা, বড় কষ্ট। ও পাপথেকে রক্ষা পেয়ে গেছি রে।

সুশীলা আরক্ত নেত্রে চাহিয়া বলিল—আর ভালবাসবে না?

না।

কাকেও না।

তা বলতে পারি নে, তবে মেয়ে মানুষকে আর ভালবাসব না। বড় কষ্ট!—নগুর স্বর কাঁদিয়া উঠিল।

সুশীলা অপলকদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—আমাকেও না?

দূর পাগলী!—নগু হাসিল।

সুশীলা পথরোধ করিয়া বলিল—হাসলে হবে না, বল, বাসবে কি-না? নইলে...

নগু ভয় পাইয়া বলিল—ওরে রাক্কুসী, তোকে নতুন করে ভালবাসব কি বল? এ পোড়া বুক যে তুই-ই পুড়িয়ে দিয়ে গেছিস, রাক্কুসী! সে-যে রাবণের চিতা, দিনরাত জ্বলছে, দিনরাত জ্বলছে! আবার বলছিস্‌...

সুশীলা আরও শুনিতে চাহিতেছিল আরও, আরও! কিন্তু ইচ্ছা দমন করিল। এত সৌভাগ্য সে এক সঙ্গে সহিতে পারিল না।

বলিল—চল।

দাওয়ার নীচে নামিয়া বলিল—নগুদা! তুমি আইন জান—কেউ যদি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে স্ত্রী কি আবার...

নগু সভয়ে বলিল—সে কি রে?—সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

ভয় নেই, অন্য লোকের কথা। এস!

—সুশীলা!

সুশীলা তাহাকে টানিতে টানিতে বলিল—ভয় নেই, এস!

তাহারা অঙ্গনটুকু পার হইয়া গেল।

সুশীলা অশ্রুভারাক্রান্তস্বরে ডাকিল—নগুদা!

নগু চলিতে চলিতে বলিল—কেন বল্ দিকিনরে—কি হয়েছে সুশীলা? তুই এমন ভাবে, নগুর কাছে ফিরে আসবি—এ যে স্বপ্নেরও অগোচর সুশীলা!

সুশীলা চুপ্!

—কি বল্ ত ভাই ব্যাপারখানা?

আঃ—চল।

নগুর কৌতুহল অদম্য হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল—বল্না সুশীলা?

—মনে আছে নগু-দা, যেদিন কাকা বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেন, তুমি কি বলেছিলে? মনে আছে?

—না; কি বল্ত?

—মনে নেই? সেই যে…

কেবলমাত্র তাহার দৃষ্টির ভাব প্রকাশেই নগুর বিস্মৃতির দ্বার ঠেলিয়া সে কথাগুলা মনের মধ্যে উঁকি মারিল। সে কথা বলিয়াছিল বলিয়া আজ নগু অনুতপ্ত; মুখখানা ম্লান হইয়া গেল।

কদম ও ভরস সামনেই দাঁড়াইয়াছিল; বাড়ীর বাহিরে পা দিতেই তাহারা উভয়ে সামনা-সামনি হইয়া পড়িল।

নগু বলিল—এরা এসেছে সঙ্গে?

—হ্যাঁ।

একটা মোড় ফিরিতেই তাহার নারী-কণ্ঠের উচ্চ আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল। কে-জানে কেন সে স্বর সুশীলার বড় পরিচিত, বড় আপনার,

বড় প্রিয় বোধ হইল। কান্নার কথাগুলা কিছুই বোঝা যাইতেছিল না, সুশীলা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

নগু-র ও গা কাঁপিতেছিল। গ্রামে কাহার ঘরে কি সর্বনাশ হইল? আজ দুইদিন সে ভিন্ন গ্রামের মাঠে চাষ করিতে গিয়াছিল, অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিয়াছে। গ্রামের কিছুই খবর জানিত না; ইচ্ছা হইতেছিল, ছুটিয়া খবর নেয়, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দেয়, কিন্তু সুশীলা—আসিয়াছে যে।

যত কাছে—শব্দ তত স্পষ্ট।

সুশীলা সভয়ে কহিল—কোন্ দিক থেকে আওয়াজটা আসছে নগু-দা?

—মনে হচ্ছে ত বোসেদের বাড়ী। তোকে ও-বাড়ীতে রেখে দেখ্‌ছি, চ'-না।

কিন্তু দশ পা অগ্রসর হইতেই সুশীলার রক্ত জল হইয়া গেল। এ-যে তাহারই দুঃখিনী জননীর আর্ত্ত ধ্বনি! এ-যে তাঁহারই হাহাকার! তবে কি তাহার কাকা...

সুশীলা ছুটিল; নগু তাহার সঙ্গে ছুটিল; কদম-ও পিছনে পড়িয়া রহিতে চাহিল না; নগদ অষ্ট আনা পয়সা এবং রাত্রিবাসের স্থানের লোভে রাম ভরম তেয়ারীও ছুটিল।

এ-যে সুশীলার নাম করিয়াই চীৎকার উঠিয়া আকাশ খানাকে কাটিয়া ফেলিতেছে।

সুশীলা প্রাণপণ শক্তিতে ছুটিয়া গৃহে পা দিয়াই শুনিতে পাইল, তাহার পিতৃব্য কাকিমাকে বলিতেছেন—কাল রাত্রেও বেশ ছিলেন, আজ বেলা আট-টার সময় হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে মারা গেছেন। কলকাতার মস্ত বড় নামজাদা জমিদার, খবরের কাগজে কত শোক